**HUMAYUNNAMA**

*Bengali translation of Gulbadan Begum's Autobioghraphy of Emperor Humayun.*

প্রস্তাবনা

www.amarboi.com

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে মির্জা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবুর হিন্দুস্থানে আফগানি শাসনের অন্ত ঘটিয়ে মুঘল শাসনের প্রবর্তন করেন। ১৫২৬-এর এপ্রিল মাসে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। হিন্দুস্থান বিজয়ের পর বাবুর নিজের নামের আগে 'মির্জা' উপাধিটি ত্যাগ করে 'বাদশাহ' এই উপাধি গ্রহণ করেন। বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে বসেন। নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ করা বাদশাহ হুমায়ুনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিহারের পাঠান সর্দার শেরশাহ সুরি সমস্ত পাঠান শক্তিকে সংহত করে হুমায়ুনের মোকাবেলা করেন এবং দুটি যুদ্ধে বাদশাহ হুমায়ুনকে এমনভাবে পরাজিত করেন যে বাদশাহকে হিন্দুস্থান ত্যাগ করে পালাতে হয় এবং ইরানে শাহ তহমাস-এর দরবারে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধ তো ছিলই তার উপরে বাদশাহ হুমায়ুনের জীবনে ছিল দীর্ঘকাল চলে আসা ভ্রাতৃবিরোধ, যার সমাপ্তি ঘটে মির্জা হিন্দালের মৃত্যু এবং মির্জা কামরানের চোখ অন্ধ করে দেয়ার পর। এরপর আবার দীর্ঘ লড়াইয়ের পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা আকবর বাদশাহ হন। হুমায়ুনের জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত, জয় পরাজয় নিয়ে লিখিত হয়েছে 'হুমায়ুননামা'। লেখিকা গুলবদন বেগম সম্পর্কে বাদশাহ হুমায়ুনের বৈমাত্রের ভগিনী। গুলবদন বেগম ভ্রাতুষ্পুত্র সম্রাট আকবরের অনুরোধে 'হুমায়ুননামা' লিখতে প্রবৃত্ত হন এবং হুমায়ুনের হিন্দুস্থান উদ্ধারের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কাহিনির সমাপ্তি ঘটান। মনে হয় পাণ্ডুলিপির শেষের দিকের কয়েক পৃষ্ঠা কোনো কারণে খোয়া গিয়েছিল। সেজন্যই এই স্মৃতিচারণাটিকে একটু অসম্পূর্ণ বলে বোধ হয়। গুলবদন বেগমদের পারিবারিক কথ্য ভাষা ছিল তুর্কি। বাবুর তাঁর আত্মজীবনী তুর্কিতেই লিখেছিলেন, কিন্তু 'হুমায়ুননামা' রচিত হয়েছে ফারসিতে। মনে হয় কাবুল উপত্যকায় মুঘলেরা আসার পর সেখানকার ভাষা ফারসিকেই তাঁরা লিখিত ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মূল রচনার কিছু অসঙ্গতিকে পরিশিষ্ট পর্যায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

AMARBOI.COM

## বাবুর পর্ব

বাদশাহ আকবরের ইচ্ছা ও আগ্রহ, আমি যেন আমাদের বংশের গৌরব শাহানশাহ বাবুর এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা এবং বাদশাহ আকবরের ওয়ালিদ (পিতা), বাদশাহ হুমায়ুন সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা লিখে রাখি। শাহানশাহ বাবুর যখন ধরাধাম ত্যাগ করেন তখন আমার বয়স বোধ হয় সাত-আট হবে, এবং তখনকার স্মৃতি সে ভাবে আমার মধ্যে জীবিত নেই। তা সত্ত্বেও বাদশাহ আকবরের আদেশের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজের স্মৃতিতে যেটুকু সঞ্চয় আছে এবং শাহি মহলে থাকার জন্য যে সমস্ত ঘটনা আমি শুনেছিলাম, কিংবা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তারই ভিত্তিতে আমি আমার স্মৃতিকথা লেখা আরম্ভ করছি।

আমার স্মৃতিকথার প্রথমেই আমি শ্রদ্ধেয় পিতা শাহানশাহ বাবুরের বৈচিত্র্যময় জীবনের ঘটনাবলির কথা উল্লেখ করব। শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁর আত্মকাহিনি 'বাবুরনামা'-তে তাঁর জীবনের সমস্ত কথাই প্রায় উল্লেখ করেছেন, তা সত্ত্বেও আমি আমার জানা ও শোনা কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ করছি।

হজরত মহাপ্রাণ সম্রাট তৈমুরলঙ থেকে আরম্ভ করে আমার মহামান্য পিতা শাহানশাহ বাবুর পর্যন্ত যে কয়জন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী গত হয়েছেন তার মধ্যে আমার পিতা জীবনে যে ভয়ংকর এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেরকম আর কারও জীবনে বোধ হয় ঘটেনি।

আমার পিতার বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখন তিনি ফরগনার সিংহাসনে আসীন হন (৫ রমজান ৯০৯ হিজরি) এবং তাঁর নামে খোতবা পড়া হয়। এর পরের এগারো বছর ধরে তিনি ফরগনার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য চাঘতাই, তৈমুরি ও উজবেক খান ও সর্দারদের সঙ্গে যে ধরনের প্রাণঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন তা বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। সাম্রাজ্যের প্রসার এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে যে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে, যে ভয়ানক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন সে ধরনের সংগ্রামী শাহানশাহর পরিচয় ইতিহাসে বিরল। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করা, শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত ও পরাস্ত করার জন্য যে অপরিসীম স্থৈর্য ও ধৈর্য তিনি দেখিয়েছেন, যে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে বিপদকে উপেক্ষা করে তার মুখোমুখি হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় তার তুলনা মেলা ভার। আলা হজরত শাহানশাহ বাবুর পরপর দুবার আপন বাহুবলে সমরখন্দ অধিকার করেছেন। বারো বছর বয়সে আলা হজরত প্রথমবার সমরখন্দ অভিযান করেন, দ্বিতীয় সমরখন্দ অভিযানকালে তাঁর বয়স ছিল উনিশ বছর। বাইশ বছর বয়সে তিনি তৃতীয়বার সমরখন্দ আক্রমণ করেন তবে এই অভিযান আলা হজরতের পক্ষে সুখকর হয়নি। ছয়মাসকাল ধরে সমরখন্দ অবরুদ্ধ ছিল এবং আলা হজরতের পক্ষে সেই সময় ছিল ঘোর দুঃসময়। অবরোধকালে আলা হজরত শাহানশাহ বাবুরের পিতৃব্য হোসেন মির্জা

AMARBOI.COM

খোরাসানে ছিলেন। পিতা তাঁর কাছ থেকে কোনো সহায়তাই পাননি। সুলতান মাহমুদ ছিলেন কাশগড়ে। তাঁর পক্ষ থেকেও পিতা কোনো সাহায্য পাননি। কোনো দিক থেকে কোনো রকম সহায়তা না পেয়ে পিতা এই সময় অত্যন্ত মুহ্যমান অবস্থায় থাকতেন।

একরকম ঘোর দুর্যোগকালে শয়বানি বেগ পিতার কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে যদি আমার পিতার সহোদরা খানজাদা বেগমের সঙ্গে তার বিবাহ হয় তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং সমরখন্দ অবরোধ মুক্ত হতে পারে।

একরকম বাধ্য হয়েই পিতা ওই বিবাহে সম্মতি দেন এবং খানজাদা বেগমের সঙ্গে শয়বানি খানের বিবাহ হয়। এরপর পিতা দুর্গ ত্যাগ করেন।

সমরখন্দ ত্যাগ করার সময় মাত্র দুশোজন সৈনিক আমার পিতার সহযাত্রী ছিল। এই সৈনিকদের অবস্থাও ছিল খুবই সঙিন। লাঠি ব্যতিরেকে অন্য কোনো অস্ত্রও প্রায় ছিল না, পরনের বেশভূষাও ছিল জীর্ণ এবং পায়ে জুতোর পরিবর্তে ছিল পাহাড়ি মেষ পালকদের চপ্পল-চারুক।

এত দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও পিতা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা হারাননি। তিনি তাঁর ওই বাহিনী নিয়েই বদখসান ও কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেন।

কুন্দুজ ও বদখসানে খসরু শাহর সৈন্যবাহনী এদিক-ওদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তাদের অনেকেই পিতার খিদমতে এসে নাম লেখাতে লাগল। খসরু শাহ স্বয়ং এসে পিতাকে সালাম জানান। ইতিপূর্বে খসরু শাহ এক জঘন্য অপরাধ করেছিলেন। বাইসনুকুর মির্জাকে তিনি হত্যা করেছিলেন এবং সুলতান মাসুদ মির্জার চক্ষু উপড়ে নিয়েছিলেন। ওই দুই মির্জাই ছিলেন আমার পিতার খুল্লতাত। পিতা তাঁর দুঃখকষ্টের জীবন আরম্ভ হওয়ার আগেই একবার কুন্দুজে এসেছিলেন, এবার প্রয়োজন তাঁকে এখানে আবার নিয়ে এসেছিল। প্রথম দিকে কিছু সদয় ব্যবহার করলেও পরে খসরু শাহ আমার পিতার সঙ্গে শত্রুতামূলক ব্যবহার করতে থাকেন এবং এক সময় আমার পিতাকে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।

যেহেতু আমার পিতার মধ্যে মানবিক ভাবনা এবং দয়া প্রবণতা খুব বেশি রকমের ছিল সেজন্যই পিতা খসরু শাহর জঘন্য কাজকর্মের প্রতিশোধ নেননি। তিনি খসরু শাহকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁকে তাঁর নিজস্ব ধনদৌলত, রত্নভাণ্ডার নিয়ে ইচ্ছামতো জায়গাতে চলে যাবার সুযোগ দিলেন। পিতার কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করার পরই খসরু শাহ উট ও খচ্চরের পিঠে তাঁর যাবতীয় সম্পদ চাপিয়ে নির্বিঘ্নে খোরাসান অভিমুখে রওনা হন। অন্য দিকে আমার পিতাও কাবুল অভিমুখে যাত্রা করেন।

কাবুলের শাসনকর্তার পদে এই সময় ছিলেন মুহম্মদ মুকিম। তিনি ছিলেন নাহিদ বেগমের ভ্রাতার পুত্র। উলুগবেগ মির্জার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুর রাজ্জাক মির্জার কাছ থেকে বাহুবলে কাবুলের শাসনভার ছিনিয়ে নেন। আবদুর রাজ্জাক মির্জা ছিলেন আমার পিতার খুড়তুতো ভাই।

কাবুলে পৌঁছে পিতা সেখানকার দুর্গ অবরোধ করেন। দুই-তিনদিন এই অবরোধ স্থায়ী হয়। মুহম্মদ মুকিম সামান্য কয়েকদিন যুদ্ধ করেই হাল ছেড়ে দেন এবং পিতার



সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির সর্ত অনুসারে কাবুল দুর্গ এবং নগর পিতার অধিকারে আসে। মুহম্মদ মুকিম নিজের ধনদৌলত নিয়ে কান্দাহার চলে যায়। কান্দাহারে মুহম্মদ মুকিমের পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। কাবুল বিজয় ঘটেছিল ৯১০ হিজরি রবিউস-সানিতে।

কাবুল বিজয়ের পর পিতা বঙ্গাসের দিকে যাত্রা করেন এবং সেই জায়গা দখল করে আবার কাবুলে ফিরে আসেন। এসময় আমার পিতামহী মহামান্যা হজরত খানম ছয়দিন অসুস্থ থেকে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'বাগ-এ-নওরোজি'-তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। পিতামহীকে সসম্মানে কবর দেওয়ার জন্য পিতা আলা বাগ-এ-নওরোজির মালিককে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

এই সময় খোরাসানের বাদশাহ সুলতান হোসেন মির্জা পিতাকে অনুরোধ করে এক ফরমান পাঠালেন যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এবং উজবেক বেগ অচিরেই যুদ্ধ যাত্রা করছি, এরকম অবস্থায় আপনি যদি আমাদের সাহায্য করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে খুবই ভালো হবে।' এই ফরমান হজরতে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর রহমত রূপেই এসেছিল। পিতা অবিলম্বে খোরাসান রওনা হলেন মির্জার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। পিতা খোরাসান পৌঁছানোর আগেই সুলতান হোসেন মির্জার মৃত্যু হয় এবং আমার পিতা পথিমধ্যে সেই সংবাদ পান। সুলতান মির্জার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর আমির ওমরাহরা কাবুলেই ফিরে যাবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু পিতা তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, এতদূর যখন আসা হয়েই গিয়েছে তখন আর সামান্য দূর খোরাসানে না যাওয়াটা ভালো হবে না। সেখানে পৌঁছে অন্তত শাহজাদাদের পিতার মৃত্যু জনিত শোকে সান্ত্বনা তো দিতে পারব।

অতঃপর শাহানশাহ বাবুর তাঁর লোকজন, আমির ওমরাহ, সৈন্য-সামন্ত সহ খোরাসান পৌঁছালেন। খোরাসানে মির জাহান যখন সংবাদ পেলেন যে বাদশাহ বাবুর নিজে খোরাসান এসেছেন তখন তিনি অন্য সকলকে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে ছুটলেন। শাহজাদা বদিউজ্জমান ওই দলে সামিল হয়নি। বদিউজ্জমানের না আসার কারণ সুলতান হোসেন মির্জার দুই সভাসদ বরনাতুক বেগ এবং জুন্নুন বেগ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে বাদশাহ বাবুর তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো। অতএব আমার পিতা হুজুরেরই কর্তব্য আগে তাকে (বদিউজ্জমান) অভিবাদন জানানো, তারপরই উভয়ে করমর্দন করবেন। কাশেম বেগ এবিষয়ে আলোচনা কালে বললেন, অবশ্যই বাদশাহ বাবুর শাহজাদার চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু চেঙ্গিজি বিধান (তোরা) অনুসারে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। কারণ তিনি একাধিকবার নিজের শক্তিতে সমরখন্দ জয় করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হল, যে বাদশাহ যখন প্রবেশ করবেন তখন সকলেই উপস্থিত থাকবেন। সর্বাগ্রে থাকবেন বদিউজ্জমান এবং তিনি বাদশাহ বাবুরকে আলিঙ্গন করবেন।

বাদশাহ বাবুর যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন কিন্তু সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করে বদিউজ্জমান বাদশাহর সামনে অনুপস্থিত থাকলেন। কাসেম বেগ পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি দুই সভাসদ বরনাতুক ও জুন্নুন বেগকে জিজ্ঞাসা করলেন মির্জা কোথায়, তাঁর তো অভ্যর্থনা জানাতে আসার কথা। ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে

AMARBOI.COM

এসে উপস্থিত হলেন এবং বাদশাহকে স্বাগত জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন এবং সবশেষে দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

যে কদিন বাদশাহ বাবুর খোরাসানে ছিলেন, মির্জা এবং লোকজনেরা বাদশাহকে প্রচুর সমাদর করেন, তাঁর সম্মানে বিশেষ ভোজসভা আহূত হয়। খোরাসানের সুরম্য অট্টালিকারাজি ও মনোরম উদ্যান সমূহ তাঁকে দেখানো হয়। মির্জা জাহান বাদশাহকে আরও কিছুকাল খোরাসানে থেকে যাবার অনুরোধ করেন, কারণ শীতে পথচলা বেশ কষ্টের হবে। তিনি আরও বলেন যে গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই তিনি উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। কিন্তু ঘটনা ছিল এই যে মির্জা জাহান এবং মির্জা বদিউজ্জমান যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করেননি।

সুলতান হোসেন মির্জার শাসনে খোরাসান ছিল এক সুন্দর দেশ। সেখানকার শাসন ব্যবস্থা ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির্জা জাহান বহু চেষ্টা করেও নিজেকে সুলতানের যথার্থ উত্তরাধিকারী রূপে তুলে ধরতে পারেননি। বাদশাহ বাবুর যখন দেখলেন মির্জা জাহান তাঁর ভোগ বিলাসিতা এবং আরও অন্যান্য খেয়ালের পিছনেই অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চলেছেন, তখন তিনি আর খোরাসানে অনর্থক বসে থাকাকে সমীচীন মনে করলেন না। পরাজিত দেশগুলির হালহকিকত জানবার অছিলায় তিনি খোরাসান ত্যাগ করেন এবং কাবুলে ফিরে আসেন।

সে বছর প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হয়েছিল যার ফলে শাহি লোক-লস্কর পথ হারিয়ে ফেলে। বাদশাহ বাবুর ও কাসিম বেগ দুটো পৃথক পৃথক পথ ধরে চলতে থাকেন। মনে হয়েছিল রাস্তাটি খুব দীর্ঘ হবে না। আমির ওমরাহরা বাদশাহকে অজানা অচেনা পথে চলতে নিষেধ করল, কিন্তু বাদশাহ তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। এর ফলে আমির ওমরাহরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের পছন্দের পথে চলতে আরম্ভ করে। বাদশাহ বাবুর, কাসেম বেগ ও তাঁর পুত্রেরা তিন-চার দিন ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে পথকে তুষারমুক্ত করেন। এরপর এই পথে লোকজন, সৈন্য সবই চলাচল করতে আরম্ভ করে। বাদশাহ বাবুর তাঁর অল্প কিছু সঙ্গীর সঙ্গে বহুকষ্টে গৌড়বন্দে এসে পৌঁছান। কিন্তু এখানেও ছিল এক বিপদ। এখানে হাজারা সম্প্রদায়ের কিছু লোক বিদ্রোহী হয়ে শাহি ফৌজকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং তাদের প্রচুর ছাগ-মেষ শাহি ফৌজের অধিকারে আসে ও তারা বহাল তবিয়তে কাবুলে এসে পৌঁছায়।

বাদশাহ বাবুর যখন কাবুলের উপকণ্ঠে মিনার পর্বতের কাছে এসে পৌঁছেছেন তখনই খবর পাওয়া গেল যে মুহম্মদ হোসেন গুরকাস ও মির্জা খান বিদ্রোহ ঘোষণা করে কাবুল দখল করেছেন। বাদশাহ এই সংবাদ পেয়েই কাবুল দুর্গে অবরুদ্ধ-অবস্থান থাকা লোকজনদের ভরসা দিয়ে এক পত্র লেখেন, 'তোমরা নিরাশ হয়ো না। আমি অবিলম্বে কাবুলে পৌঁছাচ্ছি। মাহারো পর্বতের চূড়ায় আগুন জ্বেলে আমি আমার আগমন বার্তা ঘোষণা করব। তোমরাও দুর্গের তহবিলখানার উপরে আগুন জ্বালবে, যাতে তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে পারি। রাত পোহালেই আক্রমণ হবে দু-দিক থেকে। ওদিক থেকে তোমরা আর এদিক থেকে আমি।' সকালে কাবুল দুর্গের ভিতর থেকে



আক্রমণের ভরসায় না থেকে বাদশাহ বাবুর একাই আক্রমণ করেন এবং কাবুলকে শত্রুদের দখল-মুক্ত করেন।

মির্জা খান তাঁর মায়ের বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করেন। মির্জার মা ছিলেন বাদশাহের মাসি। মা নিজে পুত্রকে সঙ্গে করে বাদশাহের দরবারে হাজির হন এবং তাঁর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। আর-এক মির্জা মুহম্মদ হোসেন নিজের স্ত্রীর বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। মির্জার স্ত্রীও ছিল বাদশাহের আর একজন মাসি। প্রাণের ভয়ে মির্জা মেঝেতে বিছানো গালিচার নীচে গিয়ে লুকিয়ে ছিল এবং ভৃত্যদের বলেছিল গালিচাটিকে টান টান করে দিতে যাতে বোঝা না যায় তার নীচে কোনো মানুষ বা ওই জাতীয় কিছু আছে। কিন্তু তার এই লুকিয়ে থাকার খবর তার ভৃত্যরাই বাদশাহর দরবারে পৌঁছে দেয়। তারাই মুহম্মদ হোসেন মির্জাকে বন্দি করে বাদশাহর সামনে পেশ করে। বাদশাহ তাঁর মাসিদের মর্যাদা রক্ষার জন্য দুই অপরাধীকেই ক্ষমা করে দেন। বাদশাহ তাঁর মাতার ভগ্নীদের বিশেষ সম্মান করতেন। তাঁর স্বভাব ছিল প্রতিদিন তিনি তাঁর মাতৃস্বসাদের বাড়িতে যেতেন, তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। এই ঘটনার পরও বাদশাহ তাঁর নিয়মের পরিবর্তন করেননি বরং আরও বেশি বেশি করে তাঁদের প্রতি হৃদ্যতা প্রকাশ করেন যাতে তাঁরা বাদশাহের দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা না করেন। বাদশাহ তাঁর মাতৃস্বসাদের বিশাল জায়গির প্রদান করেন। এই ভাবে কাবুল এবং তার সংলগ্ন জায়গা বাদশাহর অধিকারভুক্ত হয়। এই সময় আমার পিতার বয়স মাত্র তেইশ। তখনও পিতার কোনো সন্তানাদি হয়নি। একটি পুত্র সন্তানের জন্য তিনি খুবই কাতর ছিলেন। পিতার সতেরো বছর বয়সের সময় সমরখন্দের মির্জা সুলতান আহমদের কন্যা আয়েষা সুলতান বেগমের গর্ভে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শিশুটি এক মাসের বেশি বাঁচেনি।

আল্লাহ্‌র রহমতে কাবুল বিজয় পিতার পক্ষে অসীম সৌভাগ্যরূপে দেখা দেয়। কাবুলে থাকার সময়েই বাদশাহর আঠারোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

প্রথমা স্ত্রী মহম বেগমের গর্ভে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হজরত হুমায়ুন, বারবুল মির্জা, মেহেরজান বেগম, ঈশান বেগম ও ফারুক মির্জার জন্ম হয়।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মাসুমা বেগমের গর্ভে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় এবং তার জন্ম মুহূর্তে মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য মেয়ের নামও রাখা হয় মাসুমা বেগম। তৃতীয়া স্ত্রীর নাম গুলরুখ বেগম। গুররুখ বেগমের গর্ভে মির্জা কামরান, মির্জা আসকরি, মির্জা শাহরুখ, মির্জা সুলতান আহমদ ও গুলগাদার বেগমের জন্ম হয়। চতুর্থ স্ত্রী দিলদার বেগমের গর্ভে গুলরঙ বেগম, গুলচেহারা বেগম, মির্জা হিন্দাল, গুলবদন বেগম (লেখিকা) এবং মির্জা আলোয়ারের জন্ম হয়।

অনেক দুঃখ কষ্টের পথ পার হয়ে কাবুল বিজয়ের পর আল্লাহ যেন পিতা হজরতকে দু-হাত ভরে জীবনের সমস্ত সুখ আনন্দ উজার করে দিলেন। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে দুজন মেহেরজান বেগম ও গুলরঙ বেগম খোসত নগরে জন্মগ্রহণ করে। বাকি আমরা সকলেই কাবুলে জন্মগ্রহণ করেছি।

হজরত হুমায়ুন আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো ছিলেন। ৪ জিলকদ (৯১৩

AMARBOI.COM

হিজরি) মঙ্গলবার কাবুলে বাদশাজাদার জন্ম হয়। গোধূলি লগ্নে তাঁর জন্ম হওয়ার জন্য সমস্ত পশ্চিমাকাশ তখন রক্তবর্ণ ছিল। এ যাবৎকাল বাদশাহ বাবুরকে সভাসদ, আমির ওমরাহ, সকলেই মির্জা বাবুর সম্বোধন করত। বাদশাজাদা হুমায়ুনের জন্মের পর তিনি ফরমান জারি করেন যে এখন থেকে তিনি মির্জা বাবুর নয়, বাদশাহ বাবুর নামে অভিহিত হবেন। তখনকার রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী শাহজাদারা সকলেই মির্জা সম্বোধিত হত।

বাদশাজাদা হুমায়ুনের জন্মের পর তাঁকে সুলতান হুমায়ুন খান এবং শাহ ফিরোজ কদর এই নামেও ডাকা হতে থাকে। হুমায়ুন এবং অন্যান্য ভাইবোনের জন্মের পর আরও একটি খোসখবর এসে পৌঁছাল যে ইরানের শাহ ইসমাইল তৈমুরি খান শয়বানি বেগকে হত্যা করেছে। এই শয়বানি বেগের আক্রমণেই আলা হজরত পিতা বাহাদুর সমরখন্দ ছাড়তে বাধ্য হন এবং শয়বানি বেগ পিতৃস্বসা খানজাদা বেগমকে বিবাহ করেছিল।

শয়বানি বেগের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাদশাহ বাবুর মির্জা নাসিরের হাতে কাবুলের ভার দিয়ে পরিবার পরিজন সহ অর্থাৎ মির্জা হুমায়ুন, মেহেরজান বেগম, মির্জা বারকুল, নাসুমা সুলতান বেগম ও মির্জা কামরানকে সঙ্গে নিয়ে সমরখন্দ যাত্রা করেন। শাহ ইসমাইলের সহযোগিতায় বাদশাহ সমরখন্দ অধিকার করেন এবং বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতে মার্ভেরাহার অঞ্চলও নিজের দখলে নিয়ে আসেন।

কিন্তু এই সুখ তাঁর বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বাদশাহ বাবুরের নিজের ভাই এবং কিছু মুঘল সর্দাররা বাদশাহর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি ওবায়েদুল্লা খানের কাছে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে হারার পর তাঁর শক্তি এতটাই কমে যায় যে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমরখন্দ ত্যাগ করার পরিকল্পনা করেন। সমরখন্দ ত্যাগ করে তিনি বদখসানের দিকে রওনা দেন এবং মার্ভেরাহার অঞ্চল দখলের স্বপ্ন চিরতরে বিসর্জন দেন। ৯২০ হিজরিতে আলাহজরত বাদশাহ বাবুর আবার কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করেন।

এবার আর পশ্চিমে নয়, এবার পূর্ব দিকে, অর্থাৎ হিন্দুস্থান, সেদিকে অভিযান করার একটা সুপ্ত ইচ্ছা বাদশাহর মনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই জাগ্রত ছিল, কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা, উজির ইত্যাদিরা এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহমত হননি। এজন্য তাঁর অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে থেকে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধ মতের আমির ওমরাহরাও বাদশাহের হিন্দুস্থান অভিযানের বিষয়ে তাদের বিরোধিতার সুর অনেক নামিয়ে আনে। ৯২৫ হিজরিতে তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই মতো অগ্রবর্তী ঘাঁটি তৈরির জন্য ওয়াজুর আক্রমণ করেন এবং দখল করেন। এই যুদ্ধে তাঁর হাতে প্রচুর স্থানীয় লোকের মৃত্যু হয়।

এই সময় মালিক মনসুর ইউসুফ জায়ির কন্যা আফগানি আগাচাকে পিতা বিবাহ করেন এবং ইউসুফ জায়িকে খেলাত ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন সে যেন নিজের এলাকায় গিয়ে চাষাবাদ করে। কাসেম বেগ কাবুলেই ছিলেন। বাদশাহ বাবুর এই সময় একটি পুত্র সন্তানের জনক হন। বাদশাহের পুত্রলাভের সংবাদ কাসেম বেগ বাদশাহ লিখিত পত্র মারফত জানতে পারেন এবং উত্তরে কাসেম বেগ বাদশাহর হিন্দুস্থান বিজয়ের সাফল্য কামনা করে বলেন যে হিন্দুস্থানের সিংহাসন আপনার জন্যই



অপেক্ষা করছে। আপনি প্রভু আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। বাদশাহর এই নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় হিন্দাল। বোধহয় হিন্দুস্থানের উপকণ্ঠে জন্ম বলে সন্তানের এরকম নাম রাখা হয়েছিল। ওয়াজুর অধিকার করে বাদশাহ ভেরার দিকে অগ্রসর হন। ভেরা বাদশাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে। বাদশাহ বাবুর নগরীর অধিবাসীদের অভয় দান করেন। এখান থেকে চার লক্ষ শাহরুখি মুদ্রা আদায় করা হয় এবং তার সমস্তটাই সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই অর্থ বিতরণের সময় সৈন্যদের ব্যক্তিগত ভৃত্য ইত্যাদিরাও বাদ পড়েনি। এরপর বাদশাহ আবার কাবুলে ফিরে আসেন। এরপর বাদশাহ বাবুর বদখসানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এক আমন্ত্রণ পত্র পেলেন যেখানে বলা হয়েছে যে মির্জা খানের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর পুত্র মির্জা সুলেমান খুবই বালক। উজবেকেরা বদখসানের কাছাকাছি আছে, তারা বদখসানের এই দুর্বলতার সুযোগে তাকে কেড়ে না নেয়। বদখসান নিয়ে কি করবেন বাদশা বাবুর ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। এসময় মির্জা সুলেমানের মাতা বাদশাহ সলামতের দরবারে অবস্থান করছিলেন। অবশেষে বাদশাহ বদখসানের বাসিন্দাদের ইচ্ছা ও মির্জা সুলেমানের মাতার বাসনা মতো পর্যাপ্ত জায়গির মির্জা সুলেমানকে প্রদান করেন। তার পিতার সমস্ত ধনসম্পদও তাকে দিয়ে দেন এবং মির্জা হুমায়ুন বাদশাজাদাকে বদখসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বদখসান শাসনের ফরমান পেয়েই শাহজাদা হুমায়ুন সেখানকার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। আমার পিতা এবং বিমাতা মহম বেগমও কিছুকাল পরেই বদখসান যাত্রা করেন। কিছুকাল ওখানে থাকার পর তাঁরা কাবুলে ফিরে আসেন কিন্তু মির্জা হুমায়ুন ওখানেই থেকে যান।

এরপর বাদশাহ কালাত ও কান্দাহার জয় করার পরিকল্পনা করেন। কালাতে পৌঁছানো মাত্রই তারা আত্মসমর্পণ করে এবং পিতা বিনা যুদ্ধে কালাত অধিকার করেন। এরপর পিতা কান্দাহার অভিযান করেন। কান্দাহার কিন্তু কালাতের মতো সহজে হার স্বীকার করেনি। পিতা কান্দাহার অবরোধ করেন। এই অবরোধ দেড় বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর কান্দাহারবাসীরা উপায়ান্তর না দেখে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় কিন্তু আল্লাহর কৃপাদৃষ্টি ছিল পিতা হুজুরের উপরে। কান্দাহার জয় করে পিতা প্রচুর সোনা লাভ করেন। প্রাপ্ত সম্পদ ও অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে এবং মির্জা কামরানকে কান্দাহারের শাসনকর্তা-পদে অধিষ্ঠিত করে পিতা কাবুলে ফিরে আসেন। সেদিন ছিল ৯৩২ হিজরি সফর মাসের কোনো এক জুম্মাবার (শুক্রবার)-এর প্রভাত। পুবের আকাশ তখন উষার আলোকে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল।

৯৩২ হিজরি সাত কিংবা আট মাসের মধ্যে পিতার শাহিফৌজ বেশ কয়েকবার হিন্দুস্থানের বুকে আক্রমণ চালায়। প্রতিবারই কোনো না কোনো অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। যেমন ভেরা, ওয়াজুর, শিয়ালকোট, দেবলপুর ও লাহোর তিনি প্রথম আক্রমণেই জয় করেন। ইয়াকুব গ্রামের পথ ধরে পিতা অভিযান আরম্ভ করেন এবং লাহোর নগর, দুর্গ, এমনকি সেখানে যাতায়াতের পথও পিতা হুজুরের দখলে আসে।

৯৩২ হিজরি রজব মাসে পিতা মির্জা মুহম্মদ জহিরুদ্দিন বাবুর সিকান্দার বিন বাহলুল লোদির পুত্র ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পানিপথে সৈন্য সমাবেশ

AMARBOI.COM

করেন। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে, যুদ্ধে পিতা জয়লাভ করেন এবং দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। এই যুদ্ধ জয়ে পিতার প্রতি আল্লাহ্ অসীম করুণা বর্ষণ করেছিলেন, কেন না পানিপথের এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদির পক্ষে ছিল একলক্ষ আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, এবং পনেরোশো রণহস্তী। অন্য দিকে পিতা হুজুরের পক্ষে নিয়মিত ও অনিয়মিত লোক-লস্কর মিলিয়ে বারোশো লোক ছিল। তার মধ্যে পেশাদার সৈন্য ছিল ছশো থেকে সাতশোর মতো। *

পিতা হুজুর এযাবৎ কাল যুদ্ধ জয় করে পাঁচজন বাদশাহের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ গনিমত হিসেবে পেয়েছিলেন তার সবটাই তিনি লোক লস্করদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানি আমির ওমরাহরা এই বিলিয়ে দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ করে বলে যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহের ধনভাণ্ডার এভাবে নিঃশেষ হতে দেওয়া চলে না। যখন যখন যে সুলতান এই সিংহাসনে আসীন হয়েছেন তখনই তিনি পুরানো ধনভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন, এটাই দস্তুর। কিন্তু পিতা হুজুর ওই সব কথায় কান না দিয়ে সমস্ত ধনভাণ্ডার নির্দ্বিধায় সকলের মধ্যে বণ্টন করেন।

বাদশাহ বাবুরের অন্যতম সঙ্গী খাজা কালাবেগ বাদশাহকে অনুরোধ করে তাকে যেন একবার কাবুল যাবার অনুমতি দেয়া হয়। হিন্দুস্থানের আবহাওয়া তার শরীরের পক্ষে মোটেই খাপ খাচ্ছে না। আলা হুজুরের ইচ্ছা ছিল না যে কালাবেগ তখনই দিল্লি ছেড়ে চলে যাক। কিন্তু কালাবেগ পণ করে বসেছিল কাবুলে যাবার জন্য। বাধ্য হয়ে পিতা হুজুর তাকে কাবুল যাবার অনুমতি দিলেন। পিতা তাকে বললেন কাবুলে যাবার সময় হিন্দুস্থানের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রের সঙ্গে একখানা পত্রও কাবুলে নিয়ে যাবে। পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে আমি যে সমস্ত ধনসম্পদ লাভ করেছি, তারই একটা অংশ তোমার মারফত কাবুলে পাঠাচ্ছি। কাবুলে অবস্থিত আমার আত্মীয় স্বজন, ইয়ার দোস্ত এবং অন্তঃপুর বাসিনীর মধ্যে এগুলোকে বিতরণ করবে। আমার পত্রের সঙ্গে একটা তালিকাও থাকবে। তুমি এই তালিকা অনুসরণ করবে এবং সেই মতো জিনিসপত্র বণ্টন করবে। তিনি এছাড়াও বললেন, বাগ এবং দিওয়ানখানাতে সমস্ত বেগমদের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ তৈরি করবে এবং তাদেরকে আমার কথা জানিয়ে বলবে তারা যেন কায়মনোবাক্যে খোদার কাছে আমার পূর্ণ বিজয়ের জন্য নিয়মিত সেজদা ও প্রার্থনা করে। আল্লা হজরতের নির্দেশ মতো নিম্নলিখিত বস্তুগুলি তোফা হিসাবে বেগমদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

প্রতিটি বেগম পাবে সুলতান ইব্রাহিম লোদির একজন করে নৃত্যবালা। এছাড়া জওহর, ইয়াকুত, আলমাস, দমর্দআরিদ, জমরুদ, ফিরোজা, জবরজদ ও আইনুত্তমর ইত্যাদি মূল্যবান প্রস্তরে সজ্জিত একটি সোনার থালা এবং সদফি আশরফি ভরা একটি খাঞ্চা (ঝুড়ি জাতীয়) তাদের খিদমতে পেশ করতে হবে। ঠিক সেই মতোই একটি সুবর্ণ রঙের জহর, সোনার

---

* ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ঘটনাটি অতিরঞ্জিত। বাবুরের বাহিনীতে বারো হাজারের মতো নিয়মিত সৈন্য ছিল এবং যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে কামান প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বুকে কোনো যুদ্ধে কামানের ব্যবহার হয়নি। অনু:



আশরফি, সোনার শাহবুশি ইত্যাদির সমন্বয়ে সাজানো উপহার সামগ্রী সাজিয়ে আমার অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বদের নজরানা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই একটি করে সুন্দরী দাসীও দিতে হবে। আরও কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রী আমার কাছেই রইল, পরে সুযোগ সুবিধা মতো সেগুলিও পাঠাব। বাদশাহের নির্দেশে উপরোক্ত উপহার সামগ্রী তাঁর সহোদরা, সমস্ত পুত্রকন্যা, বেগমগণ, আত্মীয়স্বজন, ধাত্রীমাতা, আগাহা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভগিনীদের এবং অনেক শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। সমস্ত বণ্টনই যেন বাদশাহ প্রেরিত তালিকা অনুসারে হয়।

খাজা কালাবেগ কাবুলে এসে পৌঁছালেন। তাঁর পৌঁছনোর সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন জায়গিরদারেরাও এসে দেওয়ানখানার বাগে অবস্থান করতে থাকেন। আনন্দে গর্বে তাদের বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, কারণ বাদশাহ বাবুর অবশেষে হিন্দুস্থান জয় করেছেন। আর এখানে এসে বাদশাহর জীবনে আরও উন্নতি, জয় এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে খোদার দরবারে সেজদা করেন। আপস ছিলেন সম্পর্কে আমার মাতুল। তার জন্য বিশেষ করে বাদশাহ হুজুর খাজা কালাবেগ মারফত একটি বিশাল আকারের আশরফি পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহি ওজন প্রণালী অনুযায়ী আশরফিটির ওজন ছিল তিন সের আর হিন্দুস্থানি ওজন অনুসারে পনেরো সের। বাদশাহ খাজা কালাবেগকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে আপস যখন জিজ্ঞাসা করবে যে বাদশাহ বাবুর গাজি আমার জন্য কী পাঠিয়েছেন তখন তুমি বলবে, মাত্র একটি আশরফি। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটির আকার খুব বড়ো হলেও এটি ছিল একটি আসরফিই। আশরফিটি পেয়ে আপস খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং তিন দিন তিনি আশরফিটির কাছ ছাড়া হননি। আলা হজরত বলেছিলেন যে আশরফিটির মধ্যে একটি ছিদ্র করে তাতে একটি দড়ি বেঁধে যেন আপসের গলায় পরানো হয় এবং তারপর তাকে সমগ্র হারেমে ঘোরানো হয়।

আশরফিটি যখন আপসের গলায় পরানো হয় তখন তিনি যতটা না বিস্মিত হয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি হয়েছিল তাঁর কষ্ট। বস্তুটির ভারে আপসের গর্দান ভেঙে যাবার দশা হয়েছিল। বাধ্য হয়ে সে আশরফিটিকে গলা থেকে খুলে হাতে ঝুলিয়ে নেয়। আশরফিটিকে হাতে ঝুলিয়েই আপস চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে বেড়ান এবং বলতে থাকেন—খবরদার এই আশরফিতে কেউ হাত দিও না। বাদশাহ বাবুর এটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। বেগমেরাও খুশি হয়ে তাঁকে দশটি করে আশরফি দিয়েছিলেন, যার ফলে আপসের কাছে প্রায় সত্তর আশিটি আশরফি জমা হয়।

খাজা কালা বেগমকে কাবুল রওনা করিয়ে বাদশাহ বাবুর আগ্রাতে মির্জা হুমায়ুন সহ অন্যান্য মির্জা ও আমির ওমরাহদেরও পুরস্কৃত করেন। তাছাড়া তাঁর সঙ্গে সামান্যতম আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এমন লোকদের কাছেও পত্র পাঠিয়ে জানালেন তারা যদি বাদশাহ বাবুরের দরবারে চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে বাদশাহ তাদের প্রার্থনা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। বিশেষ করে যারা আমার ওয়ালিদ মির্জা উমর শেখ কিংবা তাঁরও পিতার অধীনে কাজ করেছে তাদের আবেদন সর্বাগ্রে বিবেচিত হবে। তাদের যথোপযুক্ত বেতন এবং পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

AMARBOI.COM

হজরত সাহেব-এ-কেরান (তৈমুরলঙ) এবং চেঙ্গিজ খানের বংশোদ্ভূত উত্তরপুরুষদের অবগত করা হচ্ছে যে তারা যতশীঘ্র সম্ভব আমার দরবারে উপস্থিত হোন। মেহেরবান আল্লাহ্ আমাকে হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য দান করেছেন, আমার এই সৌভাগ্যের সময়ে তারা এসে আমার পাশে দাঁড়ান আমার দরবারে খিদমত করে তারা ধনবান এবং উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন হোন, এই আমার বাসনা।

বাদশাহের এই ডাকে সাড়া দিয়ে সুলতান আবু সঈদের সাত কন্যা, গওহর শাদ বেগম, ফখর জাঁহা বেগম, খোদেজা সুলতান বেগম, বদিউল জামাল বেগম ও আক বেগম ইত্যাদি—তুঘাই বাদশাহ সুলতান মাহমুদ খানের কন্যা জয়নব সুলতান খানম এবং এলাচা খান তুঘাই খুর্দ-এর কন্যা মোহেব সুলতান খানমও হিন্দুস্থানে চলে আসেন। এইভাবে শাহি পরিবারের প্রায় একশত মহিলা হিন্দুস্থানে এসে হাজির হন। বাদশাহ বাবুর তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক বাসভবন ও জায়গিরের ব্যবস্থা করেন। এতদব্যতীত অনেককে নগদ অর্থও দেন।

চার বছরের মতো সময় পিতা আগ্রাতে ছিলেন। প্রতি শুক্রবারে তিনি তাঁর পিতৃষ্বসাদের সালাম জানাতে, তাদের কুশল মঙ্গল জানতে তাদের বাসভবনে যেতেন। গ্রীষ্মের সময় একদিন চারদিকে গরম বাতাসের প্রবাহ চলছিল, তখন আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মাতা আমার পিতা হুজুরকে বলেন, আলা হজরত, এই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে একদিন যদি আপনি আপনার পিতৃষ্বসাদের সান্নিধ্যে না যান তাহলে তার জন্য তাঁরা কিছু মনে করবেন না।

হজরত বাদশাহ মাতাকে বলেন, মহম বেগম তুমি একথা বলছ? সুলতান আবু সঈদ মির্জার কন্যারা আজ পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃহীনা। আজ যদি আমি তাদের সঙ্গে দেখা না করি, তাদের কুশল সংবাদ না নিই, তাহলে কে করবে সেই কাজ? আমার এখনও মনে আছে, বৃদ্ধ খাজা কাশেমকে আমার পিতা হুজুর একদিন আদেশ করেছিলেন যে তোমার কাছে আমি একটি ত্যাগের অঙ্গীকার দাবি করি এবং সেটা হল আমার এবং আমার পিতার পিতৃষ্বসারা যদি নিজেদের মহলে তোমাকে নিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নিতে চায় এবং সে কাজ যত বড়োই হোক তুমি তা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করবে।

এরপর বাদশাহ যমুনা নদীর তীরে অনেক ভবন ও অট্টালিকা নির্মাণের আদেশ দেন। নিজের ব্যবহারের জন্য একটি মহল তৈরি করেন। যেটি আগাগোড়া পাথরে তৈরি ছিল। এই মহলের হারেম এবং বাগিচার মধ্যখানে একটি বিশ্রামের স্থানও ছিল। দিওয়ানখানাতেও একইরকম সুন্দর পাথরের তৈরি কক্ষ ছিল—যার মধ্যে ছিল একটি হৌজ (বড়ো চৌবাচ্চা) এবং চারধারে চারটি ছোটো ছোটো কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়া বাদশাহ এক ফরমান জারি করেছিলেন যে ঢোলপুরের এক সুরক্ষিত প্রান্তরে পাথর খোদাই করে পরপর অনেকগুলো হৌজ তৈরি করা হবে। তিনি বলতেন হৌজ তৈরি হয়ে গেলে সরাব দিয়ে সেগুলিকে পূর্ণ করবেন। কিন্তু পিতা বাহাদুর খানুয়াতে রাণাসঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে জীবনে আর মদ্য স্পর্শ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেজন্য ঢোলপুরে ওই হৌজগুলি সরাবের বদলে লেবুর শরবত দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল।

পানিপথের যুদ্ধের এক বছরের মধ্যেই সংঘটিত হয় খানুয়ার যুদ্ধ। হিন্দুস্থানের মধ্য



অঞ্চল থেকে একদল বিদ্রোহী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে আরম্ভ করে। অনেক নবাব, আমির ওমরাহ, রাজা ও রাণা, যারা ইতিপূর্বে বাদশাহ বাবুরের দরবারে এসে আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসভঙ্গ করে রাণাসঙ্গের পক্ষ নেয়। এমনকি কুল জালালি, সম্বল, রাপুড়ি পরগনাতেও রাণা, রাজা ও আফগানরা ছিল, যাদের বাদশাহ খুব বিশ্বস্ত মনে করতেন, তারাও বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে এবং বাদশাহ বাবুরের বিরুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অংশ নেয়।

এই সময় শাহি জ্যোতিষী গণনা করে বলেন এই যুদ্ধ বাদশাহর অনুকূল হবে না। সে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সর্বত্র রটনা করে দিল যে, গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ, বাদশাহ বাবুরের যুদ্ধ যাত্রায় না যাওয়াই ভালো। জ্যোতিষীর এই বাণী শুনে শাহি ফৌজের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তাদের হতাশা এবং অধৈর্য ভাব ক্রমে বাদশাহকেও বিচলিত করে তোলে। সমস্ত ঘটনা দেখে বাদশাহ বাবুর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং উপায় খুঁজতে থাকেন। এদিকে শত্রুপক্ষ প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। তিনি স্থির করলেন, যে সমস্ত আমির-ওমরাহ, সুবেদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যারা এখনও তাঁকে ছেড়ে চলে যায়নি তাদের একত্রিত করবেন। সকলকে একত্রিত করে বাদশাহ তাদের উদ্দেশে বলেন, 'হিন্দুস্থানের এই আগ্রা শহর থেকে আমাদের পৈত্রিক ভূমিতে যেতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগে। আমরা যদি যুদ্ধে পরাজিত হই কিন্তু আল্লাহতালার রহমতে প্রাণে বেঁচে যাই তাহলেই বা কি? কোথায় থাকব আমরা, আর কোথায় আমাদের পিতৃপুরুষের দেশ। বিদেশে শত্রুপক্ষের লোকেদের হাতে আমাদের প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিত, অত্যাচরিত হতে হবে। অতএব এই দুর্যোগের সময় আমাদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—আমাদের দুটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, খোদার পথে আমরা অবিচল ভাবে লড়াই করে যাব। যদি বেঁচে থাকি তাহলে গাজি (বিজয়ী) হব, অন্যথায় শহিদ। এই পথই আমাদের নৈতিক অবলম্বন এবং নিজেদের নিরাপত্তার একমাত্র প্রতিশ্রুতি।'

বাদশাহের এই ভাষণ সমবেত সকলের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, প্রত্যেকেই বাদশাহর সঙ্গে ঐক্যমত্য হলেন এবং বজমে তালাকের (স্ত্রী বিয়োগের) শপথ এবং পবিত্র কোরানে কসম খেয়ে সুরা-এ-ফাতেহা পড়ে সমস্বরে বললেন, 'হে মহান বাদশাহ, আমাদের শরীরে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্তও থাকবে, আপনি বিশ্বাস রাখুন, ততক্ষণ তাকে উৎসর্গ করতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হব না।'

খানুয়াতে রাণাসঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের দুদিন আগে আব্বা হুজুর সরাবপান এবং অন্যান্য দূষিত ক্রিয়াকর্ম খোদার নামে ত্যাগ করেন। বাদশাহর দেখাদেখি অন্যান্য যোদ্ধারাও শপথ নেয় যে তারাও এরপর থেকে সরাব স্পর্শ করবে না। সোনারুপোর তৈরি যত পেয়ালা, সুরাহি (ঝারি) ইত্যাদি ছিল, সবই ভেঙে ফেলা হল এবং সেই সোনা-রুপো গরিব ও ফকিরদের খয়রাত করা হল। বাদশাহর অধিকারভুক্ত সব অঞ্চলে ফরমান জারি হল যে খাজনা ও জিজিয়াকর এবং যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা বেনিয়ম থাকলে অবিলম্বে তা যেন বন্ধ হয়, এবিষয়ে অপরাধীদের এবারের মতো আমি মার্জনা করলাম। যে কোনো ব্যক্তি সে রাহি মুসাফিরই (পথিক-যাত্রী) হোক বা বণিক, দেশের সর্বত্র বিধি

AMARBOI.COM

নিষেধ হীন ভাবে যাতায়াত করতে পারবে। তাদের চলাফেরার অধিকারের উপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলবে না। রাণাসঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগের দিন সংবাদ পাওয়া গেল যে সুলতান হোসেন মির্জার দৌহিত্র এবং আয়েষা সুলতান বেগমের পুত্র, সুলতান কাসেম হোসেন শাহি শিবির থেকে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে অবস্থান করছেন। তিনি খোরাসান থেকে এখানে এসেছেন। বাদশাহ বাবুর তাঁর সৈন্য পরিচালকদের কাছে জানতে চাইলেন যে সুলতান কাসেম হোসেনের সঙ্গে কত সৈন্য আছে? জানা গেল, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি এসেছেন। বাদশাহ এই খবর পেয়ে অত্যন্ত গোপনে এক হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে প্রস্তুত করে তাদের বললেন যে তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুলতান কাসেম হোসেনের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং সকালে তারা সম্মিলিতভাবে যেন অগ্রসর হয় যাতে শত্রুপক্ষ ভেবে নেয় যে এই সৈন্যদল নতুন এসেছে। বাদশাহর এই পরিকল্পনা সকলেই অনুমোদন করলেন। পরের দিন ২ জমাতুল উলা ৯৩৩ হিজরির সকালে কোহ সিক্রির উপকণ্ঠে খানুয়া নামে এক জায়গায় রাণাসঙ্গের সঙ্গে পিতা হুজুরের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে এক সময় মনে হয়েছিল যে বোধ হয় বাদশাহ বাবুর গাজি হতে পারবেন না তাকে হয়তো শহিদই হতে হবে কিন্তু খোদাতালার অসীম কৃপায় পিতা হুজুরেই জয় হয় এবং তিনি গাজি আখ্যালাভ করেন।

রাণাসঙ্গের যুদ্ধ বিজয়ের এক বছর পর আমার জননী মহমবেগম কাবুল থেকে হিন্দুস্থান আসেন। এই যাত্রায় আমিও মাতার সঙ্গে ছিলাম। আমার অন্যান্য ভগিনীরাও পূর্বেই এখানে এসে পৌঁছেছিল। মহম বেগম যখন কুল (আলিগড়) এসে পৌঁছালেন, তখন পিতা হুজুর আমাদের জন্য তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক ও দেহরক্ষী পাঠালেন। কুল থেকে আগ্রা পর্যন্ত দেহরক্ষীরা আমাদের সঙ্গে ছিল। আমার পিতা হুজুরের ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজে কুলজালাল পর্যন্ত গিয়ে মাতাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। মাগরিবের নামাজের সময় পিতা হুজুরের কাছে সংবাদ গেল যে আমরা ছাউনির দুই ক্রোশের মধ্যে এসে পড়েছি। একথা শোনার পর পিতা হুজুর অশ্ব প্রস্তুত করারও সময় পেলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ পদব্রজে চলতে আরম্ভ করলেন এবং সে ভাবেই আমার মাতার কাছে গিয়ে পৌঁছান। বাদশাহর এই অবস্থা দেখে মাতাও সওয়ারী ছেড়ে বাদশাহের হামসফর হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনিও পদব্রজে চলতে চান কিন্তু পিতা হুজুর তাঁকে বিরত করেন এবং তিনি মাতার হাওদার সঙ্গে হাঁটতে থাকেন। এভাবেই আমরা ছাউনিতে পৌঁছাই।

পিতা হুজুরের সঙ্গে মায়ের পুনর্মিলনের পর আমার উপরে আদেশ হয় আমি যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই পিতা হুজুরের খিদমতে উপস্থিত থেকে তাঁকে সালাম আদাব জানাই। নয়জন সওয়ার পিতা হুজুরের পাঠানো মোহাফা (পালকিবাহক) কাবুল থেকে আসা মোহাফা এবং আমার মাতার সঙ্গে কাবুল থেকে যে একশত মুঘল খাদিম এসেছিল তাদের সকলকেই সুসজ্জিত অশ্ব দান করা হয়। নওগ্রামে আমাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হয়। আমি মোহাফাতে সওয়ার ছিলাম। আমার মাতার ভাইয়েরা আমাকে মোহাফা থেকে নামালেন। যেখানে নেমেছিলাম সেটা ছিল একটা সুন্দর বাগিচা। বাগিচাতে কিছু না বিছিয়ে,



সবুজ ঘাসের উপরেই আমি বসলাম। পিতার পক্ষ থেকে তার খলিফা সস্ত্রীক এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। আমি খলিফার সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে কাছে ডেকে আমার মাথায় করস্পর্শ করলেন। এরপর তাঁর স্ত্রী সুলতানুম এলেন। আমি আবার উঠে দাঁড়াবার সংকল্প করছি, তখন খলিফা আমাকে নিরস্ত করলেন, বললেন, আমি তোমার পিতা বাদশাহ বাবুরের অতি পুরানো এক খাদিম। তিনিই আমাকে এই মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তিনিই করুণা পরবশ হয়ে আদেশ দিয়েছেন যে আমার সম্মানে সকলকেই উঠে দাঁড়াতে হবে, না হলে আমার মূল্য কি? খলিফা আমার সম্মানে ছয় হাজার শাহরুখি (আশরফি) ও পাঁচটি অশ্ব নজরানা পেশ করলেন। আমিও আনন্দের সঙ্গেই সেগুলি গ্রহণ করলাম। এরপর সুলতানুম বেগমও আমাকে তিন হাজার শাহরুখি ও তিনটি অশ্ব নজরানা দিলেন। অভ্যর্থনার কায়দা কানুন শেষ হলে পরে সুলতানুম বেগম বললেন যে আহার্য প্রস্তুত আছে, যদি আমরা তা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করি তাহলে উপস্থিত দাস-দাসী, লোক লস্কর সকলেই সম্মানিত বোধ করবে। বাগিচার মধ্যখানে একটি জায়গাতে মঞ্চ তৈরি করা ছিল। মঞ্চটিতে প্রচুর সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল। উপরে ছিল একটি রঙিন চাঁদোয়া। ভিতরে গুজরাটি জরির কারুকাজ করা একটি লাল রঙের চাদর বিছানো ছিল। আরেকটি চারকোণা কাতানের ঘেরা দিয়ে সাময়িক একটি প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। আমি শাহবাগে খলিফার নিজস্ব কক্ষে বসে আহার করলাম। পঞ্চাশটি খাসির মাংসে রান্না করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত রুটি ও সরবত।

এরপর পুনরায় মোহাফার কাছে ফিরে এলাম কিন্তু তাতে ওঠার আগে খলিফার কদমবুসি করলাম। শাহবাবা খলিফা আনন্দে আমাকে উঁচুতে তুলে ধরলেন, বক্ষে টানলেন এবং অনেক আদর সমাদর জানালেন। তাঁর ওই মধুর ব্যবহার আমাকে কতখানি আনন্দিত করেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

আগ্রাতে আমাদের থাকার তিনমাস হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে বাদশাহ ঢোলপুর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন, মাতা মহম বেগম এবং আমি ওই ভ্রমণে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলাম। পিতার আদেশ মতো ঢোলপুরের প্রান্তরে খোদাই করে সারি সারি হৌজ বানানো হয়েছিল। পিতা হুজুর ওই হৌজগুলোর মধ্যে একটি করে বেদি তৈরির আদেশ দেন। বেদি তৈরি হবার পর পিতা ছোটো নৌকাতে চড়ে সেখানে যেতেন এবং ওখানে বসে চারদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। ঢোলপুর থেকে আমরা সিক্রিতে আসি। হৌজের ওই চবুতরাগুলো আজও যথাবস্থায় আছে। সিক্রিবাগে আরও একটি চৌকন্দি (মঞ্চ) তৈরি করা হয়েছিল। পিতা হুজুর এখানে একটি তুরখানা নির্মাণ করেন যেখানে বসে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন।

একদিন আমি এবং আমার এক বিমাতা অফগানি আগাচা মহলে বসেছিলাম। মাতা সাহিবা গিয়েছিলেন নামাজ পাঠ করতে। আমি আফগানি আগাচাকে অনুরোধ করলাম আমার ডান হাতটা একটু টেনে দিতে। কিন্তু তার টান দেয়াটা এত জোরে হয়ে গেল যে আমার হাতের কব্জি ঢিলা হয়ে গেল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলাম। চিৎকার শুনে সকলেই দৌড়ে এল এবং তারা হাকিম সাহেবকে ডেকে আনল। তিনি আমার কব্জি পুনস্থাপন করে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলেন।



AMARBOI.COM

পিতা হুজুরের অন্যান্য বেগমেরাও কাবুল থেকে রওনা হয়েছিলেন। শাহবাবা খলিফা তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য নওগ্রাম যাত্রা করলেন। আমার জ্যেষ্ঠ পিতৃস্বসা খানজাদা বেগম ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অভ্যর্থনাই ছিল প্রধান। এদের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বেগমেরা। সকলেই শাহবাবা খলিফাকে দাঁড়িয়ে সালাম জানান। এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদা করে সকলেই আগ্রা রওনা হন। বাবা খলিফা তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন পর আলা হজরত বাদশাহ বাবুর 'বাগ-এ-জর্‌-আফশা' পরিদর্শনে যান। এখানে একটি ওজুখানা তৈরি হয়েছিল যা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি সেটিকে দেখে বলেন এতদিনে আমার সব ইচ্ছা পূর্ণ হল, এখন ইচ্ছা হয় সব কিছু ত্যাগ করে এই বাগিচার নির্জনতার মধ্যে দিন গুজরান করি। আমার কোনো লোকজনেরও প্রয়োজন হবে না শুধু একজন আফতাবচি (জলবাহক) হলেই যথেষ্ট। বাদশাহির ভার এবার মির্জা হুমায়ুনের হাতেই অর্পণ করব। পিতার এহেন আক্ষেপ শুনে আমার মাতা এবং অন্য পরিজনদের মধ্যেও কান্নাকাটির ঢল নামল। তাঁরা সকলে মিলে বাদশাহর কাছে আরজ পেশ করলেন যে, খোদা আপনাকে আরও বহুদিন সলামতে রাখবেন এবং খোদার যতদিন মর্জি হবে ততদিন আপনি বাদশাহি করবেন। আপনার হাজার বছর আয়ু হোক আপনার পুত্র কন্যারা আপনার চোখের সামনেই বৃদ্ধ হবে ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর কিছুদিন পর আমার এক ভ্রাতা মির্জা আলোয়ার অসুস্থ হন। তাঁর পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা হত। বহু হাকিম, বৈদ্য, দেখিয়েও কোনো ফল হল না। মির্জা আলোয়ার আর সুস্থ হলেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওই কম বয়সেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হয়। মির্জা আলোয়ারের মৃত্যুতে বাদশাহ হুজুর খুবই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মির্জা আলোয়ারের মাতা দিলদার বেগম ছিলেন আমার গর্ভধারিণী। পুত্রের মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই তিনিও খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। মির্জা আলোয়ার ছিলেন যেমনই সুদর্শন তেমনই গুণবান। শেষ পর্যন্ত পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে দিলদার বেগম উন্মাদ হয়ে যান। এই অবস্থায় আলা হজরত মাতা ও অন্যান্য বেগমদের বললেন, চল, সকলে মিলে আমরা ঢোলপুর যাই। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে হয়তো আমাদের সকলেরই মন ভালো হয়ে যাবে। ঢোলপুর যাবার জন্য নৌকা ঠিক করা হল।

হঠাৎই দিল্লি থেকে মওলানা মুহাম্মদ ফরগলির একখানা পত্র এল যাতে লেখা হয়েছে যে মির্জা হুমায়ুন গুরুতর অসুস্থ। একে তো অল্প কদিন আগে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আলোয়ারের দেহান্ত হয়েছে। এখন মির্জা হুমায়ুনের অসুস্থতার সংবাদে আমার মাতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কোনোমতে তাঁর জ্ঞান ফেরানো হলে প্রচণ্ড মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা নিয়েই তিনি দিল্লি যাত্রা করেন। পথে মথুরাতে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ হল। যতটা অসুস্থ বলা হয়েছিল মির্জা হুমায়ুনকে তার চেয়ে বেশি অসুস্থ মনে হল। তিনি তখন অত্যন্ত দুর্বল এবং শীর্ণ। মথুরা থেকেই মির্জা হুমায়ুন সহ তাঁরা আগ্রাতে ফেরেন। আগ্রাতে আসার পর আমি এবং আমার অন্য ভগিনীরা আমাদের ফেরেস্তার মতো ভাইটিকে দেখতে তাঁর কক্ষে গেলাম এবং সকলে মিলে তাঁর রোগশয্যা ঘিরে দাঁড়ালাম। ভ্রাতা হুমায়ুন এতটাই দুর্বল ছিলেন যে ক্ষণে ক্ষণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। জ্ঞান ফিরে আসতেই



অর্ধনিমিলীত চোখে আমাদের উদ্দেশ করে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ভগিনীরা তোমরা আমার শুভেচ্ছা নাও। তোমারা দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে আমার আরও কাছে এসো। আমার বুকে এসে আমাকে ভালোবাসা জানাও, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে আমি কোনোদিন তোমাদের আলিঙ্গন করে স্নেহাশিস দিইনি। এইভাবে তিনি তিনবার আমাদের উদ্দেশে এই ধরনের কথা বললেন। ইতিমধ্যে আলা হজরত বাদশাহ বাবুর ওখানে এলেন এবং রোগীর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি হুমায়ুন মির্জার রক্তশূন্য মুখমণ্ডল দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় পিতাকে দেখেও শাহজাদা হুমায়ুন আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েন। আমার মাতা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাদশাহ হুজুরকে বললেন, আমার পুত্রের জন্য তোমার এত ভাবনা কীসের? তুমি বাদশাহ, তোমার আরও অনেক পুত্রকন্যা আছে, কিন্তু আমি হতভাগিনী মাতা, আমার ওই একটিমাত্র পুত্র। উত্তরে বাদশাহ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ বেগম, আমার আরও পুত্রকন্যা আছে। কিন্তু শাহজাদা হুমায়ুনই আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি প্রার্থনা করি তোমার এই পুত্র একদিন যশস্বী হবে এবং চিরকাল সুখে সম্পদে থাকবে। তাছাড়া সে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমার অন্য পুত্রেরা কেউই মির্জা হুমায়ুনের মতো যোগ্য নয়।

মির্জা হুমায়ুনের রোগ যখন দিন দিন বেড়ে চলেছে, চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাই প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে তখন পিতা হুজুর হজরত আলি মুর্তজাকে স্মরণ করে মির্জা হুমায়ুনের শয্যার চারপাশ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রের জীবন রক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে আল্লাহ্‌র কাছে করুণ আর্জি পেশ করলেন :

'হে মহান খোদাতালা, যদি একজনের প্রাণ দিয়ে আরেকজনের প্রাণরক্ষা আপনার মর্জি হয় তাহলে আমি আমার প্রিয়তম পুত্র মির্জা হুমায়ুনের প্রাণের পরিবর্তে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। নিজের প্রাণের বিনিময়ে আমি আমার পুত্রকে ফিরে পেতে চাই, খোদা।' হজরতে আলা বাদশাহ বাবুর যেদিন থেকে খোদার দরবারে এই আর্জি পেশ করা আরম্ভ করেছিলেন সেই দিনটি ছিল জুম্মাবারের আগের আগের দিন। আশ্চর্য! এই প্রার্থনার পরই বাদশাহ বাবুর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং শাহজাদা হুমায়ুন ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন।

প্রায় দুই-তিনমাস বাদশাহ বাবুর রোগ শয্যায় শায়িত রইলেন অন্যদিকে মির্জা হুমায়ুন সুস্থ হয়ে শাহি কাজের প্রয়োজনে কালিঞ্জর চলে যান। ইতিমধ্যে একদিন বাদশাহের রোগ এতই বৃদ্ধি পায় যে কাসেদ (দূত) পাঠিয়ে মির্জা হুমায়ুনকে ফিরে আসতে বলা হয়। মির্জা হুমায়ুন পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সমস্ত কাজ ফেলে অতিদ্রুত আগ্রায় ফিরে এসে বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হলেন। খাদিমদের উদ্দেশে তিনি বললেন, আব্বাজানের রোগ এত বেড়ে গেল কী ভাবে? যথাসময়ে শাহজাদা হাকিম, বৈদ্যদের আনালেন এবং তাদের বললেন—আমি তো আমার পিতা হুজুরকে সুস্থ দেখেই কালিঞ্জর গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর অসুখ যেন ভীষণ ভাবে বেড়ে গেছে, আপনারা এর কারণ অনুসন্ধান করে যথাবিহিত ওষুধপত্র দিন। কিন্তু সমবেত চিকিৎসকেরা কেউই বাদশাহজাদাকে সন্তোষজনক কিছু বলতে পারলেন না।

রোগশয্যায় শায়িত থেকেও আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতা বার বার মির্জা হুমায়ুনের

AMARBOI.COM

খোঁজ করতেন এবং জানতে চাইতেন তিনি কোথায় এবং কেমন আছেন। মহামান্য সম্রাটের অসুস্থতার সময়েই এক খবরচি এসে জানাল, মির খুর্দ বেগের পুত্র মির ব্রোহী এসেছেন এবং তিনি বাদশাহ হুজুরের দর্শন প্রার্থনা করেন। পিতা খবর শুনে বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং অবিলম্বে মির ব্রোহী বেগকে তাঁর কাছে আনতে বলেন। ব্রোহীবেগ কক্ষে আসতেই বাদশাহ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পুত্র হিন্দাল কোথায়? কবে সে আমার কাছে আসবে, তাকে আমি কবে দেখতে পাব। ব্রোহীবেগ অনুগতভাবে বললেন, শাহজাদা হিন্দাল দিল্লি পর্যন্ত এসে গেছেন। আগ্রা পৌঁছাতে তাঁর হয়তো আর দু-একদিন লাগবে। পিতা হুজুর অসন্তুষ্ট স্বরে ব্রোহী বেগকে বললেন, আমি খবর পেয়েছি যে কাবুলে তোমার ভগিনীর বিবাহ হয়েছে আর তুমিও লাহোরে বিবাহ করেছ, এই সব কারণেই আমার পুত্র মির্জা হিন্দাল আমার কাছে এসে পৌঁছাতে পারেনি। জানি না আমাকে তার জন্য আরও কতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। পিতা হুজুর আরও বললেন, কতকাল আমার পুত্র মির্জা হিন্দালকে দেখিনি, জানি না সে কত বড়ো হয়েছে, দৈর্ঘ্যে কতটা বেড়েছে, দেখতেই বা কেমন হয়েছে।

ব্রোহী বেগ মির্জা হিন্দালের একটা জামাহ (কোর্তা) পরে এসেছিলেন। সেটিকে দেখিয়ে তিনি হুজুরকে বললেন, বাদশাহ সলামত, আমি এই যে জামাহটি পরে আছি, এটি শাহজাদা মির্জা হিন্দালের। মির্জা হিন্দাল এই জামাহটি তাঁর অধম খাদিমকে দান করেছেন।

এবার আলা হজরত পিতা হুজুর ব্রোহীবেগকে কাছে ডাকলেন, বললেন, আমাকে দেখতে দাও, আমার পুত্র কত বড়ো হয়েছে। পিতা হুজুর রোগজর্জর শরীরেও একটা কথা বলে চলেছিলেন, কি দুর্ভাগ্য আমার, আমি আমার পুত্র হিন্দালকে দেখলাম না। পিতাকে রোগ শয্যায় যারাই দেখতে আসত, পিতা হুজুর তাদেরই জিজ্ঞেস করতেন, কী মনে হয় তোমাদের। কবে নাগাদ হিন্দাল এসে পৌঁছাবে এখানে?

রোগশয্যা থেকেই পিতা হুজুর মহম বেগমের উপরে আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করেন। এমনিতে মহম বেগমই প্রকৃত পক্ষে আমার মাতা ছিলেন। আমি তো তাঁর কাছেই প্রতিপালিত হয়েছি। বাদশাহ হুজুর মাতাকে আরও অনুরোধ করলেন, তিনি যেন আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী গুলরঙ বেগম ও গুলচেহারা বেগমের যথোপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে তিনি আরও বললেন যে, যখন হজরত মুহম্মদ জিউ এখানে আসবেন আমার কুশল সংবাদ নিতে তখন তাঁকে যেন যথোচিত আদর সমাদর করা হয়, তারপর তাঁকে বলবে যে বাদশাহ বাবুরের আত্মার শান্তির জন্য গুলরঙ বেগমকে ইয়াসিন তৈমুর সুলতান এবং গুলচেহারার সঙ্গে তোখতা বোগা সুলতানের বিবাহ সম্পাদন করতে হবে।

আমার মাতা মৃদু হেসে অন্দরে চলে গেলেন। বাদশাহের অভিপ্রায় তাঁকে জ্ঞাত করা হল এবং বলা হল এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে। তাঁকে একথাও বলা হল আপনার মতেই বাদশাহ সম্মত। মাতা পিতা হুজুরের প্রস্তাবকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করলেন এবং এই ইচ্ছা যাতে অবশ্যই কার্যে পরিণত হয় তার জন্য সকলেই খোদার দরবারে দোয়া করবেন। কারণ বাদশাহের যা অভিপ্রায় তা ছিল যেমনই সুন্দর তেমনই সর্বদিক রক্ষাকারী।

আমার মাতা, বদিউল জামাল বেগম এবং আক বেগম বাদশাহ হুজুরের খিদমতে



উপস্থিত হলেন। একটি মণ্ডপ তৈরি করে তার উপরে সুন্দর করে সাজানো ঝালর বিছানো হল। শুভ মুহূর্ত নির্ধারণ করে আমার মাতা হবু জামাতা দুই সুলতানকে কদমবুসি করার সুযোগ করে দেন এবং জামাতা হিসাবে তাদের বরণ করেন।

এসময় বাদশাহের পেটের যন্ত্রণা ভীষণভাবে বেড়ে উঠল। মির্জা হুমায়ুন তো পিতার এরকম অবস্থা দেখে ভাবনায় আকুল। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না কী করলে পিতা হুজুরের কষ্ট লাঘব হবে। হাকিম ও অন্যান্য চিকিৎসকদের সকলকেই তলব করা হল। তাদের বলা হল, স্বয়ং বাদশাহ রোগাক্রান্ত তারা যেন তাদের সমস্ত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজার করে বাদশাহের চিকিৎসা করে। যে করেই হোক তাঁকে যেন সুস্থ করে তোলা হয়। হাকিম বৈদ্যরা পুনরায় বাদশাহের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর ব্যর্থ হয়ে শাহজাদা হুমায়ুনের কাছে একরকম আত্মসমর্পণ করে বললেন, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত যে আমাদের কোনো ওষুধই আলা হজরতের রোগ নিরাময় করতে পারছে না। এখন একটাই উপায়, খোদার কাছে প্রার্থনা করা। তিনিই পারেন কোনো অদৃশ্য চমৎকারি ওষুধের মাধ্যমে বাদশাহ হুজুরের রোগ দূর করতে। এই সমস্ত আলাপ আলোচনার পর তাঁরা আবার বাদশাহের ধমনির স্পন্দন মাপলেন এবং বললেন, এই স্পন্দন দেখে মনে হচ্ছে বাদশাহ হুজুরকে বিষ দেয়া হয়েছে। হাকিমদের অনুমান সত্য ছিল। পরাজিত সুলতান ইব্রাহিমের মাতা পুত্র হত্যার প্রতিশোধের মানসে পিতা হুজুরের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছিল। আশ্চর্যের কথা এই, শয়তান বৃদ্ধাকে পিতা হুজুর মাতা সম্বোধন করতেন। তাকে বাস করার জন্য উপযুক্ত বাড়ি পর্যাপ্ত জায়গির ও অন্যান্য অনেক সুবিধাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু এরা ছিল নিম্ন জাতির এবং নিম্ন বৃত্তির। পিতার মহত্ত্ব এদের কুটিল মনে কোনো রেখাপাতই করেনি। পিতা এদের জন্য যত বেশি বেশি করেছেন এদের মনের মধ্যে হিংস্রতার বীজ তত তীব্র হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা ভাবত এসব অনুগ্রহ তাদের প্রাপ্য। প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ হিসাবেই ছিল অত্যন্ত ক্রূর, হিংস্র এবং নিমকহারাম। কথায় বলে, প্রত্যেক বস্তু নিজের প্রকৃত সত্তার দিকেই কোনো না কোনোদিন ফিরে যায়। মোটকথা, ইব্রাহিম লোদির মা যখন তার কোনো বিশ্বস্ত লোক মারফত বাদশাহের রসুইখানার বাবুর্চির হাতে এই বিষ পৌঁছে দেয়, তখন সেই বাবুর্চি তার মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। সে বিষের পুরিয়া নিয়ে এত ভয় পেয়েছিল যে তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা সে কার্যকরী করতে পারেনি। কোনো মতে নানরুটির উপরে কিছু বিষের গুঁড়ো সে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন আহারে বাদশাহ সামান্য পরিমাণই নানরুটি খেয়েছিলেন। কিন্তু বিষ এত তীব্র ছিল যে ওই সামান্য পরিমাণেই বাদশাহের বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। এই বিষক্রিয়াতেই তাঁর শরীর অসুস্থ হতে থাকে এবং দিন দিন তিনি দুর্বল ও অসত্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় পিতা হুজুরের দেহ ও মনের ধৈর্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু চেহারাতে রক্তশূন্য ভাব দেখা দিয়েছিল।

পরদিন পিতা হুজুর সমস্ত আমির, ওমরাহ, উজিরদের তাঁর কক্ষে ডাকলেন এবং তাদের বললেন, 'বহুকাল ধরেই আমার মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে আমি শাহজাদা মির্জা হুমায়ুনকে আমার সিংহাসন, বাদশাহি, সবকিছু সোপর্দ করে চলে যাব বাগ-এ-জর আফসাতে। সেখানেই আমি আমার অবসর দিনগুলি কাটাতে চাই।'

AMARBOI.COM

খোদার দয়ায় ও অনুগ্রহে এবং আপনাদের সহায়তায় আমি অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করতে পেরেছি, বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও পূরণ হয়েছে। কিন্তু রোগ, ব্যাধি আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে, এটাকেও খোদার ইচ্ছা মনে করে আমি আমার ওসিয়ত (উইল) ঘোষণা করছি যে, 'আমার সমস্ত কিছুই (সিংহাসন, মুকুট ইত্যাদি) আমি হুমায়ুনকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সকলে যেমন আমার অনুগত ছিলেন ঠিক সেইভাবে মির্জা হুমায়ুনেরও অনুগত থাকবেন এবং তার সমস্ত কাজকর্মে আপনারা সহমত হবেন। খোদার কাছে প্রার্থনা করি এবং আশা করি যে আমার পুত্র মির্জা হুমায়ুন দরবারের সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং সে প্রত্যেকের প্রিয় হবে।' এরপর বাদশাহ একটু থেমে আবার বললেন, 'পুত্র হুমায়ুন, তোমার ভ্রাতাদের, আত্মীয় স্বজনদের, দেশের অগণিত প্রজাদের আমি আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। তিনি তোমাদের পথ দেখাবেন।'

বাদশাহর মুখে একথা শুনে উপস্থিত কেউই অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। কেউ কেউ তো উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে উঠল। বাদশাহ সালামতের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। এই সংবাদ যখন অন্দর মহলে এবং বাইরের লোকজনের কাছে জানাজানি হল তখন তারা ক্রন্দন, দোয়া, প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল।

উক্ত ঘটনার তিনদিন পর ৯৩৭ হিজরির জমদিয়াল আউয়ালের পাঁচ তারিখ, সোমবারে বাদশাহ বাবুরের ইন্তেকাল হয়। মৃত্যুর প্রাক মুহূর্তে আমার পিতৃস্বসা ও মাতাদের মিথ্যা বলে অন্দরমহলে যেতে বলা হয়েছিল যে এখনই বাইরে থেকে চিকিৎসকদের দল আসবেন। এই দিনটি ছিল আমার পিতা হুজুরের বংশধর, আত্মীয় স্বজন ও নিকটজনের জন্য চরম শোকের দিন। সকলেই প্রচুর ক্রন্দন করে, বক্ষ চাপড়িয়ে আরও নানাভাবে শোক ব্যক্ত করে।

প্রথমেই বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ দরবার এবং দরবারের বাইরে প্রচারিত হতে দেয়া হয়নি। কিন্তু আরায়েশ খান নামে একজন এতদ্দেশীয় আমির পরামর্শ দেয় যে বাদশাহর মৃত্যু সংবাদ এ ভাবে বেশিদিন গোপন রাখা ঠিক নয় এতে নানারকম মিথ্যা গুজব রটানোর পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া অতীতে যখনই কোনো সুলতান বা বাদশাহের ইন্তেকাল হয়েছে, তখনই দেশে অরাজকতা, লুঠতরাজ আরম্ভ হয়েছে। এখন মোগল পরিবারের সামান্য ভুলের জন্য রিয়াসতকেই খেসারত দিতে হতে পারে। লুঠতরাজ ইত্যাদি যাতে না হয় তার জন্য আমাদের এক বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা নিতে হবে। একজনকে লাল রঙের পোশাক পরিয়ে হাতির পিঠে চাপিয়ে নাগাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করতে হবে যে আলা হজরত সুস্থ শরীরে অবসর গ্রহণ করে নির্জনে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই অবস্থায় শাহি কাজ কর্ম দেখা শোনার ও পরিচালনার সমস্ত ভার মির্জা হুমায়ুনের উপরে ন্যস্ত হয়েছে। শাহজাদা হুমায়ুন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং সেই মতোই ঘোষণা করা হয়।

শাহি ঘোষণা শুনে জনতা আশ্বস্ত হল যে বাদশাহ বাবুর অবসর জীবন যাপন করছেন। সকলে মিলে তাঁর জন্য খোদার কাছে দোয়া করল।

## হুমায়ুন পর্ব

৯৩৭ হিজরির আউয়াল মাসের নবম দিনের শুক্রবারে বাদশাহ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তিতে সারা দুনিয়া হর্ষোল্লাস প্রকাশ করে ও খোদাতালাকে মোবারকবাদ জানায়।

সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরই বাদশাহ হুমায়ুন মাতা ও ভগিনী সহ মহলের অন্যান্য আত্মীয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাদের শুভকামনা জানান। তাঁদের প্রত্যেকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন এবং সকলকে আশ্বস্ত করে একটি ঘোষণা করেন যার মোতাবেক এযাবৎকাল যাঁরা যে জায়গির, শাহি পদাধিকার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এসেছেন তাঁদের সেই সমস্ত সুবিধা আগের মতোই বলবৎ থাকবে।

ইতিমধ্যে মির্জা হিন্দাল কাবুল থেকে ফিরে বাদশাহ হুমায়ুনের দরবারে উপস্থিত হন। বহুদিন পর ভ্রাতাকে দেখে বাদশাহ হুমায়ুন যারপরনাই খুশি হন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির বেশ কিছুটা মির্জা হিন্দালকে প্রদান করেন।

বাদশাহি তখতে আসীন হবার পর বাদশাহ হুমায়ুনের সর্বপ্রথম কাজ হয়েছিল প্রয়াত পিতা হুজুরের মাজারে হাজির হওয়া। সেখানে গিয়ে বাদশাহ হুমায়ুন মুহাম্মদ আলি আছিস নামে একজনকে মাজারের মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত করেন এবং আশিজন সুকণ্ঠের অধিকারী, কোরান হাফেজে পারদর্শী ব্যক্তিকে মাজারের খিদমতে বহাল করেন। তাদের নির্দিষ্ট কাজ ছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ও কোরান পাঠ করা, যাতে বংশ গৌরব মরহুম বাদশাহ বাবুরের আত্মা খোদার অনুগ্রহ লাভ করে। সিক্রি, বর্তমানে যার নাম ফতেপুর, এই এলাকা মরহুম বাদশাহের মাজারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ওয়াকফ করা হয়। তদুপরি রিয়াজের একটি জায়গা, যার রাজস্ব আদায় হত বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা, সেটিকেও নির্দিষ্ট করা হয় আলিম উলেমাদের বেতনের জন্য।

আমার শোকার্ত মাতা মাজারের লোকজনদের জন্য দুবেলা আহার্য তৈরি করিয়ে দিতেন। সকালে এজন্য একটি গোরু, দুটি মেষ ও পাঁচটি খাসি জবাই করা হত। ফজর-এর নামাজ শেষে আরও পাঁচটি খাসির 'আস' (পোলাও জাতীয়) তৈরি হত। মাতা আকামের (মহম বেগমের অন্য নাম) তৈরি এই খাদ্য আড়াই বছর ধরে দুবেলা মাজারে নিয়মিত পাঠানো হত। আড়াই বছর পর মাতার ইন্তেকাল হয়।

আকামের জীবিতকালে বাদশাহ সলামতকে তাঁর বাসভবনে কদাচিৎই দেখেছি। ধীরে ধীরে আকামের শরীর ভেঙে পড়তে লাগল এবং তিনি শয্যা নিলেন তখন আমাকে ডেকে বললেন, তাঁর মৃত্যুর পর আমরা অর্থাৎ মরহুম বাদশাহ বাবুরের কন্যাগণ বেগম গুলরঙের বাসভবনে গিয়ে ভ্রাতাদের দর্শন করতে পারবে। মাতা আকাম যেমন বলেছিলেন, সেই অনুসারে বাদশাহ হুমায়ুন যতদিন হিন্দুস্থানে থাকতেন নিজেই আমাদের দেখতে আসতেন।

AMARBOI.COM

কোনো রকম আড়ম্বর ছাড়াই খুব সাদাসিধাভাবে তিনি আমাদের কাছে আসতেন এবং আমাদের প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ বর্ষণ করতেন। এই হতভাগিনীও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তিনি আমার বাড়িতেও আসতেন। এখানেই মাসুমা সুলতান বেগম, গুলরঙ বেগম, গুলচেহারা বেগমও এসে উপস্থিত হতেন। এঁরা সকলেই ছিলেন বিবাহিতা। এঁরাও নিয়মানুসারে আমাদের প্রিয় ভ্রাতাকে সালাম জানাতেন।

মোটকথা, আমার মাতা আকাম ও পিতা হুজুরের ইন্তেকাল হওয়ার পর শোকার্ত, আশ্রয়হীনা এই কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি বাদশাহ হুমায়ুন যে করুণার দৃষ্টি রেখেছিলেন, তার ফলেই আমার সমস্ত মনোকষ্ট একেবারে দূর হয়ে যায়। পিতা হুজুরের ইন্তেকালের পর বাদশাহ হুমায়ুন দশ বছর হিন্দুস্থানে ছিলেন। এই দীর্ঘ দশ বছরে তাঁর শাসনে রাজ্যের সর্বত্র সুখ-শান্তি বজায় ছিল। প্রজারা বাদশাহের অনুগত ছিল।

মরহুম বাদশাহ বাবুরের মৃত্যুর ছ-মাসের মধ্যেই বাহমন ও বায়জিদ গৌড় আক্রমণ করে। কাসেদ মারফত এই সংবাদ বাদশাহের কানে আসতেই বাদশাহ আগ্রা থেকে রওনা হন। তিনি বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং সেখান থেকে চিনালা যান এবং তাকেও জয় করে আগ্রায় ফেরেন।

আমার মাতা মহম বেগমের বিশেষ কামনা ছিল যে তিনি যেন মৃত্যুর আগে বাদশাহের কোনো পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পান। এজন্য তিনি যেখানেই সদ্বংশের সুন্দরি কন্যার কথা শুনতেন কিংবা দেখতেন, তাকেই কোনোক্রমে বাদশাহের সমীপে এনে উপস্থিত করে তাকে নিকাহ্ করতে বলতেন। আমির হুজুর খাজং-এর এক কন্যা ছিল, নাম মেওয়াজান। মেওয়াজান বেশির ভাগ আমার কাছেই থাকত। শাহানশাহ বাবুরের মৃত্যুর পর একদিন মাতা বাদশাহ হুমায়ুনকে বললেন, মেওয়াজান মেয়েটিকে তোমার কেমন মনে হয়। আমার তো তাকে খুব ভালো লাগে, তুমি তো তাকে তোমার জন্য গ্রহণ করতে পারো। মাতার কথা শুনে ভ্রাতা হুমায়ুন সেই রাত্রিতেই মেওয়াজানের সঙ্গে নিকাহ্ করেন। ইতিপূর্বে বাদশাহ হুমায়ুনের একটি বিবাহ হয়েছিল। বেগা বেগম কাবুলে ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানে এলেন এবং আসার কিছুকাল পর গর্ভবতী হন। বৎসরান্তে বেগা বেগম বাদশাহ হুমায়ুনকে একটি কন্যা সন্তান উপহার দেন, কন্যার নাম রাখা হয় আকিকা বেগম। এরপর মেওয়াজান আমার মাতা মহম বেগমকে জানাল যে সেও সন্তানসম্ভবা। একথা শুনে মাতা দুধরনের 'ইরাক' (সুস্বাদু খাদ্য) তৈরির আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে যার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মাবে তাকেই আমি ইরাক খাওয়াব। ইরাক তৈরি হয়েছিল পেস্তা, বাদাম, মগজ-এর সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশিয়ে। সকলেই আশা করেছিল যে একজন না একজনের পুত্র সন্তান অবশ্যই হবে। সকলেই প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিছুকাল পর বেগা বেগমের এক কন্যা জন্মাল যার কথা আগেই লিখেছি। এরপর সকলে মেওয়াজানের সন্তানের অপেক্ষায় রইলেন। গর্ভধারণের দশম মাস অতিক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে একাদশ মাসও কেটে গেল। মেওয়াজান বলল, আমার এক মাসির (জওয়ানে বেগের স্ত্রী) ঠিক বারোমাসের মাথায় সন্তান জন্মেছিল। মনে হয় আমারও বারোমাসেই সন্তান হবে। তার কথা শুনে বিশেষ প্রসূতি কক্ষ প্রস্তুত হল। ভারী গদি, বালিশ এবং আসবাবপত্র দিয়ে



সেটিকে সাজানো হল। কিন্তু কয়েকদিন পর জানা গেল সবই বৃথা। সে এতকাল সকলের সঙ্গে মিথ্যা চাতুরি করে এসেছে।

বাদশাহ হুমায়ুন ওই সময় চিনালায় যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। সেখান থেকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে তিনি আগ্রায় ফিরে এলেন। তাঁর নিরাপদে ফিরে আসার আনন্দে মাতা মহম বেগম এক উৎসব ও ভোজ সভার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষ্যে নগরকে দীপমালাতে সাজানো হয়। মহম বেগম সমস্ত পদস্থ সেনানী ও সৈনিকদের উদ্দেশ্যেও নির্দেশ জারি করেন যে তারাও যেন তাদের বাসভবন এবং তার চারদিক আলোক-সজ্জিত করে। এই দিন থেকেই কোনো বিজয় উপলক্ষ্যে নগরে আলোকসজ্জা করা আইনরূপে প্রবর্তিত হয়।

মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত একটি মঞ্চ তৈরি হল। মঞ্চে ওঠার জন্য চারদিক থেকেই ধাপের ব্যবস্থা ছিল। মঞ্চের উপরে চারটি 'জরুরি' সামিয়ানা খাটানো হয়েছিল এবং সেই একই রঙের গদি, তাকিয়া মঞ্চের উপরে রাখা ছিল। মঞ্চের বাইরের দিকে পর্তুগিজ ধাঁচের মকমাত সাজানো ছিল। আর ভিতরের দিকে ছিল ফিরিঙ্গিদের জরবস্তের শিল্পকাজ এবং থামগুলোতে সোনার কারুকাজ করা হয়। সব মিলিয়ে মণ্ডপটি দেখতে খুবই নয়নাভিরাম হয়েছিল। বিশাল মঞ্চের একধারে ছিল আমার মাতার শিবির যেটি গুজরাটের শিল্পকর্মের অনুকরণে সাজানো হয়েছিল এবং সেখানে স্বর্ণনির্মিত আফতাস, গোলাপদান এবং পেয়ালা ছিল। এই উৎসবকে উপলক্ষ্য করে আমার শ্রদ্ধেয়া জননী বারো সারি উট, বারো সারি খচ্চর, সত্তরটি সওয়ারী ঘোড়া, সত্তরটি সাধারণ ঘোড়া বাদশাহ হুমায়ুনের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট জনদের দান করেন। অতিরিক্ত, এই উৎসবে সাত হাজার লোককে খেলাত প্রদান করা হয়। বেশ কয়েক দিন ধরে এই আনন্দোৎসব চলেছিল।

ইতিমধ্যে খবর রটে গেল যে মুহাম্মদ জামান, হাজি মুহাম্মদ খান কুকির পিতাকে হত্যা করেছে এবং বিদ্রোহের প্রস্তুতি করেছে। বাদশাহ হুমায়ুন তাকে গ্রেফতার করার জন্য লস্কর পাঠালেন এবং গ্রেফতার করে বিয়ানাতে বন্দি করে রাখেন। বন্দি অবস্থায় মুহাম্মদ জামানের দেখাশোনার ভার ছিল ইয়াদগার তুগাইয়ের উপরে। ইয়াদগারের লোকজনেরা মুহাম্মদ জামানের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। এই সময় একটি ফরমান জারি করে বলা হয় যে সুলতান মুহাম্মদ মির্জা এবং নিখুব সুলতান মির্জার চোখ সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হবে। সেলাই করতে গিয়ে নিখুবের দুটি চোখই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু মুহাম্মদ মির্জার চোখ সেলাই করার সময় তার চোখের কোনো ক্ষতি করা হয়নি। এরপর মুহাম্মদ জামান মির্জা, মুহাম্মদ সুলতান মির্জা এবং শাহ মির্জা পালিয়ে যায়। যতকাল আমরা হিন্দুস্থানে ছিলাম, এই লোকগুলো সুযোগ পেলেই যুদ্ধ বিগ্রহ করে উৎপাতের কারণ হত।

বাদশাহ হুমায়ুন বাহমন ও বায়েজিদকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পর থেকে আগ্রাতেই বাস করতেন। এ ভাবে তিনি এক নাগাড়ে প্রায় বারোমাস আগ্রাতে ছিলেন। একদিন তিনি আমার মাতাকে ডেকে বললেন, যে কোনো কারণেই আমার শরীর মন ভালো যাচ্ছে না। কাজকর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। আপনার অনুমতি হলে একবার আপনাকে নিয়ে গোয়ালিয়র বেড়িয়ে আসতাম। বাদশাহের গোয়ালিয়র ভ্রমণের [illegible]

AMARBOI.COM

সহ আমার সমস্ত মায়েরা, ভগিনীরা, মাসুমা সুলতানা বেগম, যাকে আমরা কৌতুক করে বলতাম মাহ চামচা, গুলরঙ বেগম যাকে বলা হত গুল চামচা এবং বলাবাহুল্য আমি, বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের আর-এক বোন গুল চেহারা বেগম এসময় অবধে ছিলেন, কারণ তাঁর স্বামী তোখতা বোগা সুলতান তখন অবধে থাকত। তোখতা বোগা খানের আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়। গুল চেহারা বেগমের পক্ষে থেকে কাসেদ (দূত) এই সংবাদ বাদশাহের কাছে নিয়ে এল এবং বলল, বোগা সুলতানের মৃত্যুর পর এখন বেগমদের সম্বন্ধে বাদশাহের কি আদেশ? শুনে হজরত বাদশাহ মির্জাচে কে আদেশ করলেন, তিনি যেন অবিলম্বে অবধে গিয়ে বেগম গুল চেহারাকে আগ্রায় নিয়ে আসেন। বাদশাহ নিজেও গোয়ালিয়র ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে অবিলম্বে আগ্রায় ফেরা মনস্থ করলেন। এই সময় জননী আকাম (মহম বেগম) বললেন, বাদশাহের অনুমতি হলে আমি বেগা বেগম (বাদশাহের পত্নী), আকিকা বেগমকেও (বাদশাহের কন্যা), গোয়ালিয়রে আসতে বলি। ওদেরও জায়গাটা বেড়ানো হয়ে যাবে। বাদশাহ অনুমতি দিলেন। নওকার এবং খাজা কবিরকে আগ্রা পাঠানো হল তাঁদের আনতে। বেগা বেগম ও আকিকা সুলতানা আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র এলেন। গোয়ালিয়রে তাঁরা আসার পর আরও ছ-মাস আমরা সেখানে ছিলাম। তারপর একসময় গোয়ালিয়র ছেড়ে আগ্রা রওনা হলাম। আগ্রা পৌঁছাতে আমাদের শাওয়াল মাস হয়ে গিয়েছিল। শাওয়াল মাসেই আকামের পিঠে অসুখ দেখা দিল এবং ৯৪০ হিজরিতে ১৩ শাওয়াল তারিখে আকাম আমাদের ছেড়ে অন্যলোকে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর সন্তানেরা আবার তাদের পিতৃশোকের মতোই শোক অনুভব করে। বিশেষ করে আমার কথাই বলতে হয়। আমিই শোক বিহ্বল হয়েছিলাম সবচেয়ে বেশি কেন না আমি আকামের স্নেহচ্ছায়াতেই বেড়ে উঠেছি। দিনরাত শোকগ্রস্থ হয়ে রোদন করতাম। এই একটি ঘটনা যেন আমার জীবন থেকে সমস্ত শান্তি, ধৈর্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। মহামান্য বাদশাহ হুমায়ুন আমাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্য রাখতে বলতেন। আমার শোক বাদশাহকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

মহামহিম মহম বেগম যখন আমাকে আমার গর্ভধারিণী জননীর কাছ থেকে প্রতিপালনের জন্য চেয়ে নেন তখন আমার বয়স ছিল দুই বছর। কিন্তু আমার বয়স দশ হতে না হতেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আকামের তিরোধানের পর একবছর প্রায় আমি তাঁর মহলেই বাস করতাম। এরপর যখন বাদশাহ সালামত ঢোলপুর যান, তখন আমাকে আমার গর্ভধারিণী জননী দিলদার বেগমের কাছে সোপর্দ করেন।

আকামের কুলখানি (মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরের ক্রিয়াকর্ম) উদযাপনের পর বাদশাহ হুমায়ুন আগ্রা থেকে দিল্লি যান এবং সেখানে 'দীন-পনাহ্' নামের এক দুর্গের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর বাদশা আগ্রায় ফিরলে আকা জানম তাঁকে বললেন, আপনি মির্জা হিন্দালের নিকাহ্ পরবর্তী অনুষ্ঠান কবে করবেন?

হজরত বাদশাহ বললেন, আমার নাম কবুল করে বলুন তো কী অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে। মির্জা হিন্দালের নিকাহের সময় মাতা জীবিত ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। এ সমস্তই আমার নজরে আছে। আকা জানম



বললেন, জনাবে আলি, আপনার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানও তো বাকি রয়েছে, আগে সেটা সম্পন্ন হোক তারপর না হয় মির্জা হিন্দালেরটা হবে। বাদশাহ বললেন, বেশ তাই হোক।

আকা জানম বললেন, আল্লাহ্ মহান, তাঁর সমস্ত কাজই শুভ।

এই অনুষ্ঠানের জন্য নদীর ধারে একটা উৎসব ভবন এবং তোরণ তৈরি করা হয়, যার নাম রাখা হয়েছিল 'যাদুঘর'। পাথরের তৈরি সবচেয়ে বড়ো ঘরটি বানিয়ে তার মধ্যিখানে পাকা একটি হৌজ এবং হৌজের মধ্যে এক গোলাকার বেদি বসানো হল। মখমলের কালিন দিয়ে আচ্ছাদিত এই বেদিতে বসে সুদর্শন গায়ক গায়িকা, যন্ত্রীরা বসে তাদের সংগীত আলাপ করল।

সম্রাট হুমায়ুনের ক্ষমতায় আসার পর তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় তাঁর জননী মাননীয়া মহম বেগম তাঁকে একটি মনিরত্নখচিত, কারুকাজ করা সিংহাসন উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। সেটিকে সদর দরজায় রেখে তার চারদিকে জরি দিয়ে সাজানো মখমলের গদি পাতা হল। সুসজ্জিত সিংহাসনে বাদশাহ হুমায়ুন এবং আকা জানম পাশাপাশি বসলেন। আকা জানমের ডানদিকে মরহুম সম্রাট বাবুরের পিতৃস্বসার দল, সুলতান আবু সঈদ মির্জার কন্যা ফখর জাহান বেগম, বদিউল জামাল বেগম, আকা বেগম, সুলতানা বখত বেগম, গওহর সাদ বেগম ও খোদেজা সুলতানা বেগম আসন গ্রহণ করেন। অন্যদিকের গদিতে আমার পিতৃস্বসার দল—অর্থাৎ আমাদের বংশের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মরহুম সম্রাট বাবুরের ভগিনীরা—শহরবানু বেগম, ইয়াদগার সুলতান বেগম, (ইনি ছিলেন সুলতান হোসেন মির্জার কন্যা), উলুগ বেগম, (বাদশাহের খুল্লতাত পত্নী জয়নাব সুলতান বেগমের কন্যা), আয়েষা সুলতান বেগম, সুলতানি বেগম, বেগা সুলতান বেগম, (সুলতান খলিল মির্জার কন্যা), মহম বেগম ও বেগি বেগম (উলুগবেগ মির্জা কাবুলির কন্যা), খানম বেগম (আক বেগমের কন্যা), শাহ খানম (বদিউল জামাল বেগমের কন্যা), খানম বেগম (আকা বেগমের কন্যা), জয়নব সুলতান খানম (সুলতান মাহমুদ খান তুগাইর কন্যা), মোহেব্বা সুলতান খানম (এলাচা খান নামে খ্যাত সুলতান আহমদ খানের কন্যা), খানেশ মির্জা হায়দার (খালা বাদশাহর কন্যা), বেগা কেলা বেগম, কিচক বেগম, শাহ বেগম (দিলসাদ বেগমের মাতা), কাচকানা বেগম ও আপাক বেগম (সুলতান বখত বেগমের কন্যা), শাদ বেগম ও মহর আংরেজ বেগম (মোজফ্ফর মির্জার কন্যা)। শেষের দুই জন আবার পরস্পরের ঘনিষ্ঠা বন্ধু ছিলেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা পুরুষের বেশে থাকতেন। এই দুই রমণী অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন। সূচীকর্ম, শিল্পকর্ম, মল্লযুদ্ধ, সন্তরণ এবং ধনুর্বাণ চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যন্ত্র সংগীতেও তাঁদের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। এই মহফিলে আরও অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীদের আগমন ঘটেছিল যাদের সকলের নাম স্মরণে নেই। তবে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় একশত।

এই জমজমাট অনুষ্ঠানের কিছুদিন পরই মির্জা হিন্দালের নিকাহ্ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানেও মোগল কন্যারা আগের বারের মতোই মঞ্চের ডানদিক ঘেঁষে বসেছিলেন। তবে আগেকার অনুষ্ঠানটির তুলনায় এবার উপস্থিতির পরিমাণ কিছু কমই

AMARBOI.COM

ছিল। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আগা সুলতানা আগা (ইয়াদগার সুলতানের মাতা), সলিমা বেগম, সকিনা বেগম, বিবি হাবিবা ও হানিফা বেগম।

উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি এই জমকালো বাড়িটির (যার নাম যাদুঘর ভবন) সাজসজ্জা এবং আড়ম্বরের ব্যাপারে কোনো আপস করা হয়নি। প্রধান কক্ষ, অন্যান্য ছোটো ছোটো কক্ষ, অলিন্দ সব জায়গাতেই নানা ধরনের সাজসজ্জা এবং আভরণে সাজানো ছিল। বড়ো ঘরটিতে নানা ধরনের আসন রাখা হয়েছিল, যেগুলির গায়ে আবার অনেক কারুকাজ উৎকীর্ণ ছিল। আসনগুলিকে রঙিন ঝালর দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। আর মেঝেতে দুষ্প্রাপ্য গালিচা বিছানো ছিল। বিভিন্ন চাদর এবং ঝালরে দুর্মূল্য রত্নাদি এবং রঙিন কাচখণ্ড লাগানো হয়েছিল। ছোটো ঘরে রাখা হয়েছিল কারুকাজ করা পালঙ্ক, যার সামনে সাজানো ছিল সোনার পানের ডাবা, সুন্দর সুরাই (কুঁজো) এবং রুপোর তৈরি পেয়ালা ইত্যাদি। এই বাড়িটির পশ্চিম দিকে ছিল দিওয়ানখানা আর পূর্বদিকে বাগান। দক্ষিণদিকের কোণটিতেও একটি দিওয়ানখানা এবং উত্তর দিকে ছোটো ছোটো তিনটি কামরার উপরেই তৈরি হয়েছিল বালাখানা। প্রথম বালাখানার নাম দেয়া হল বালাখানা-এ-দওলত। এখানে ন-রকম যুদ্ধাস্ত্র রাখা হয়েছিল—হাতলে কারুকাজ করা শামশির (তরবারি), জরাহ্‌ককতর, খঞ্জর, জমদহর, খাঞ্জু, তারকাশ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বালাখানাটিকে বলা হত সাদতখানা। কক্ষটি জুড়ে জায় নামাজ বিছানো ছিল। থরে থরে কিতাব (বই), নকশা করা কলমদান ও সুন্দর জুজদান দিয়ে ঘরটি সজ্জিত ছিল। আরও ছিল চমৎকার চমৎকার সব চিত্র, নানা ধাঁচের হাতের লেখা, আর চন্দনকাঠ দিয়ে বাঁধানো নানা শিল্পকর্ম। পালঙ্কে ওঠার জন্য ধাপ বা সোপানে এক বিশেষ ধরনের নেহালচি বিছিয়ে তার উপরে দস্তরখান বিছানো ছিল। দস্তরখানের উপরে নানা ধরনের ফল, সরবৎ ও পানীয় রাখা ছিল। এই অপূর্ব নিকাহোত্তর অনুষ্ঠানের প্রথমে বাদশাহ আদেশ দিয়েছিলেন যে সমস্ত আমন্ত্রিত আমির, ওমরাহগণ এবং বেগমেরা যেন অবশ্যই সঙ্গে করে কোনো উপহার নিয়ে আসেন, বাদশাহের আদেশে সকলেই উপহার দ্রব্য নিয়েই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে পাওয়া উপহার সামগ্রীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। তিনটি পাত্র আশরফিতে ভরে উঠেছিল আর শাহরুখি যা পাওয়া গিয়েছিল তাতে ছটি পাত্র ভর্তি হয়ে যায়। একপাত্র আশরফি এবং দুইপাত্র শাহরুখি দেওয়া হল হিন্দুবেগকে, সরকারি খাজাঞ্চিখানার নামে জমা করার জন্য। জমা করার পর ওই আশরফি শাহজাদা, আমির, ওমরাহ ও সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। অন্য একপাত্র আশরফি ও দুই পাত্র শাহরুখি দেওয়া হল মওলা ফেরগরিকে—জ্ঞানিগুণী, বিদ্বান, চিকিৎসক, দরবেশ, ফকির ও মিস্কিনদের বণ্টনের জন্য। এরপর অবশিষ্ট একপাত্র আসরফি ও দুইপাত্র শাহরুখি বাদশাহ হুমায়ুন নিজের কাছে আনালেন। তার সামনে পাত্র তিনটি রাখা হলে তিনি বললেন, এগুলি গোনার প্রয়োজন নেই বলেই, নিজে একমুঠো আশরফি তুলে নিলেন। এরপর পাত্রগুলিকে বেগমদের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন ওখান থেকে যার যা ইচ্ছা তুলে নিতে। সকলে নেয়ার পরও দেখা গেল আশরফি রয়েছে প্রায় দু'হাজার আর শাহরুখি প্রায় দশ হাজার। সেগুলিকে এরপর অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল। উপস্থিত প্রত্যেকের



ভাগেই প্রায় দেড়শো থেকে দুশোর মতো মুদ্রা পড়েছিল হৌজ ঘেরা বেদিতে যারা ভাগে অন্যদের তুলনায় কিছু বেশি পেয়েছিল। এরপর বাদশাহ আকাজানমকে বললেন, আপনার অনুমতি পেলে হৌজের জল ছেড়ে দিই। আকাজানম বললেন, তাহলে তো ভলোই হয়। তিনি সোপানের কয়েক ধাপ উপরে উঠে বসলেন, অন্যান্যরা এই জল ছাড়ার বিষয়টি জানত না। ধীরে ধীরে হৌজ ভরে উঠতে লাগল এবং চারদিকে জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন সকলের খেয়াল হল। সকলেই হৈচৈ করে উঠল, জল ততক্ষণে তাদের গোড়ালি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এরপর দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়াদাওয়া হল এবং অনেককে খেলাত ও পোশাক উপহার দেওয়া হল। সেদিন ওখানে মেয়েরা মিনাবাজারও বসিয়েছিল।

মির্জা হিন্দালের পত্নী বেগম সুলতানম বেগম ছিলেন খাজা মেহেদির ভগিনী এবং আমার মরহুম পিতার সম্পর্কিত ভ্রাতা খাজা জাফরের কন্যা। আকাজানম সুলতানম বেগমকে নিজের মেয়ে বলে গ্রহণ করেছিলেন। তার দুবছর বয়সের সময় তাকে আবার খানজাদা বেগমের কাছে চলে যেতে হয়। খানজাদা বেগম সুলতানম বেগমকে খুবই স্নেহ করতেন। কোনো দিনই তাকে ভ্রাতষ্পুত্রী মনে করেননি, মনে করেছেন তাঁরই কন্যা। সুলতানম বেগমের নিকাহ্‌ পর্বটা খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার পিছনে তাঁর ব্যবস্থাপনারও বড়ো একটা ভূমিকা ছিল।

এই নিকাহ্‌তে তিনি অনেক কিছুই দিয়েছিলেন যৌতুকরূপে। যেমন—কোশ্‌কা এবং সেকা (পর্দা), পাঁচটি গদি, পাঁচটি পিশতোক, একটি বড়ো বালিশ, দুটি হেলান দেবার তাকিয়া। দুটি সাধারণ তোষক, দুটি মুখ ঢাকার জালি (নেকাব) এবং তিন গদিওলা একটি খিমাগাহ (তাঁবু)। এই গদিগুলি ছিল খুবই বিলাসবহুল জর্দুজি কেতায় তৈরি। এছাড়াও মির্জা হিন্দালকে শিরোপা (তাজ), রোপাক, রুমাল এবং জর্দুজি কুরপোশ উপহার দিয়েছিলেন।

সুলতানম বেগমের জন্য যে কুর্তা এবং তার উপরে পরিধানের যে জামা দেওয়া হয়েছিল তাতে লাল ইয়াকুত, জামরুদ, ফিরোজা, জবরজদ এবং আইনুল মারা নামের মূল্যবান পাথর বসানো ছিল। নটি গলাবন্ধ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল একেবারে গলা আরম্ভ হয়েছে যেখান থেকে সেই পর্যন্ত। এছাড়া হালকাদার জেফত (হার), তিনটি পাখা, একটি চতরশাহি, একটি উঁচু শামাদান এছাড়াও অনেক গৃহস্থালি তৈজসপত্র, বাসনকোসন, আসবাব ইত্যাদি যা কিছু খানজাদা বেগমের কাছে ছিল তা সবই তিনি দিয়ে দেন। এই নিকাহ্‌ অনুষ্ঠানে খানজাদা বেগম যেরকম আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন বা যৌতুক উপঢৌকন নিকাহের পাত্রীকে দিয়েছেন, সেরকম আড়ম্বর মরহুম বাদশাহ বাবুরের পরিবারের আর কোনো নিকাহ্‌তে করা সম্ভব হয়নি।

খানজাদা বেগম কারুকার্যমণ্ডিত জিন এবং লাগাম সহ নটি ঘোড়া। জরদুজি সোনা এবং রুপোর বাসনপত্র এবং ইস্ত্রিস ও হাবসি বংশজাত ন-জন দাসদাসী (গোলাম) সুলতানম বেগমকে অতিরিক্ত যৌতুক হিসাবে দান করেন।

মির্জা হিন্দালের এই নিকাহ্‌তে আমা পিতার ভগিনীপতি মেহেদীবেগ দিয়েছিলেন, কারুকার্যশোভিত বলগা এবং ছড়িসহ দুটি মোটাসোটা ঘোড়া। সোনা রুপোর বাসন, দুরকম প্রজাতির আরও আঠারোটি ঘোড়া। কিংখাবে মোড়া লাগাম,

AMARBOI.COM

খচ্চর, সাতাশটি এক প্রজাতির নটি করে তিনটি প্রজাতির, হাবসি, হিন্দুস্থানি ও তুর্কি দাসদাসী ও তিনটি হাতি।

উৎসব শেষ হবার পর মহামান্য বাদশাহ হুমায়ুন যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমন সময় কাসেদ মারফত সংবাদ এল যে খোরাসানের খান, উজির সুলতান বাহাদুর বিয়ানা আক্রমণ করেছেন। আলা হজরত মির ফকর আলি বেগ, মির তরদি বেগ এবং আরও কয়েকজন আমির ওমরাহের সঙ্গে একটি সৈন্য বাহিনীও পাঠানো হল যার নেতৃত্বে ছিলেন মির্জা আসকরি। এই বাহিনী বিয়ান পৌঁছে খোরাসানের খানকে পরাজিত করে। এরপর বাদশাহ হুমায়ুন গুজরাট যান। ৯৪১ হিজরি রজব মাসের পনেরো, গুজরাট যাবার মানসে বাদশাহ হুমায়ুন বাগ-এ-জর-আফশাঁতে প্রাথমিক শিবির স্থাপন করেন। এখানে একমাস ধরে সৈন্য বাহিনীতে লস্কর নিয়োগ ইত্যাদি কাজকর্ম চলছিল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ এখানেই ছিলেন।

হজরত বাদশাহ সপ্তাহের যে দুইদিন দরবারে বসতেন, সেই সোমবার ও বুধবার নদীর ওপারে চলে যেতেন। যখন বাগ-এ-জর আফশাঁতে থাকতেন তখন তাঁর সহোদরা ভগিনী, আজম এবং হারেমের পরিচারিকারা তাঁর খিদমতে হাজির থাকত। শিবির স্থাপনের সময়ও এরকমই করা হত। স্ত্রীলোকদের শিবিরগুলির মধ্যে মাসুমা সুলতানা বেগমের শিবিরের গুরুত্ব বেশি ছিল, তারপরেই ছিল গুলরঙ বেগমের শিবির। আজমের শিবিরও ফেলা হত তার কাছেই। এরপর আমার জননী, গুলবর্গ বেগম ও বেগা বেগমের শিবির তৈরি হত। দরবারের সভাসদ ও কর্মচারীদের শিবির হত সারি সারি ভাবে। এইসব শিবির স্থাপিত হয়ে যাবার পর বাদশাহ সেগুলি পরিদর্শনে যেতেন এবং সেই সুযোগে তাঁর ভগিনী ও বেগমদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়ে যেত। আলা হজরত বাদশা হুমায়ুনের শকট প্রথমে এসে থামত মাসুমা সুলতানার শিবিরের সামনে। অতএব বাদশাহ প্রথমে তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতেন। এরপর পরপর শিবিরগুলিতে তিনি দর্শন দিতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চলতাম। কোনো বেগম বা ভগিনীর সঙ্গে দেখা করার সময়ও আমরা পাশেই থাকতাম। দ্বিতীয় দিন বাদশাহ এই দীনার শিবিরে পদার্পণ করেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময় অনেক বেগমও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই অবসরে ছোটো একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে বাদশাহের ভগিনী ও বেগমরা, বেগাহা, আগাহা ও আগাচা অংশ নেন। যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতের মধুর আলাপে শিবির ভরে ওঠে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হবার পর বাদশাহ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে আগত ভগিনী ও বেগমরা শিবিরের মধ্যেই যে যেখানে পারলেন ঘুমে ঢলে পড়লেন। সকালে বেগা বেগম নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে এই বলে ঘুম থেকে তোলেন। হজরত বাদশাহ ওইখানেই ওজুর জন্য জল আনার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহের নির্দেশ কানে যেতেই বেগা বেগম বুঝলেন যে বাদশাহের ঘুম ভেঙেছে। তিনি অনুযোগ করে বাদশাহকে বললেন, এই বাগে আমরা এসেছি কতদিন হয়ে গেল, কিন্তু আপনি একটিবারের জন্যও আমার সঙ্গে দেখা করেননি। আমার শিবির-পথে নিশ্চয়ই কেউ কাঁটা ছড়িয়ে রাখেনি। আমিও আশা করেছিলাম যে আমার শিবিরেও আপনার উপস্থিতিতে এরকম জলসার আয়োজন হবে। আর কতকাল আপনি



আমাদের মতো হতভাগিনীদের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর থাকবেন? আমাদেরও তো হৃদয়, মন আছে। একই জায়গাতে আপনি তিন তিনবার এলেন, হাসি আনন্দে মেতে থাকলেন।

বেগা বেগমের এধরনের আক্ষেপ শুনে বাদশাহ কোনো মন্তব্য করলেন না। নিশ্চুপে নামাজের জন্য বেরিয়ে গেলেন। দিনের প্রথম প্রহর বাদশাহ বাইরের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন এবং পরে একসময় সমস্ত ভগিনী, বেগমদের সঙ্গে দিলদার বেগম, আফগানি আগাচা, গুলনার আগাচা, মেওয়াজান, আগাজান ও আফ্তাহাকে তাঁর শিবিরে আসতে বললেন। আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত হলাম কিন্তু বাদশাহ কোনো কথা বললেন না। দেখলাম তাঁর মুখ ভার। বুঝলাম বাদশাহ খুবই রেগে আছেন।

আমরা সকলেই চুপচাপ বসে আছি। এমন সময় বাদশাহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, বেগম আজ তোমরা যে ধরনের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে করেছ, সেটা করার আর কি কোনো সময় ছিল না? তোমরা সকলেই জানো যে আমি বংশের মাননীয়া আত্মীয় স্বজনদের কাছে এসেছিলাম। তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, তাদের জীবনের সমস্যার কথা মন দিয়ে শোনা এবং সম্ভব মতো তার প্রতিকারের উপায় করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তা সত্ত্বেও শাহি কাজকর্মের জন্য আমার কিছু বিলম্ব হয়েছে সেজন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম যে আমার অবস্থা অন্য সকলেও বুঝবে অথবা অন্তত বোঝার চেষ্টা করবে। যাই হোক, খোদা যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। আমার যা বলার আছে তা বলার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। আমি আফিম খাই, সব দিকে হুঁস থাকে না। সেজন্য কারও প্রতি কোনো কারণে যদি আমার দৃষ্টি না পড়ে থাকে তাতে যেন কেউ অসন্তুষ্ট না হয়। আমি সকলের কাছ থেকে এই মর্মে একটা লিখিত আকারে মুচলেকা আশাকরি যে, আপনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসুন কিংবা নাই আসুন, আমরা আপনার প্রতি অনুগত এবং সন্তুষ্ট থাকব।

শোনা মাত্র গুলবর্গ বেগম উক্ত মুচলেকাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিল এবং বাদশাহ আনন্দের সঙ্গে সেটা স্বীকার করলেন। সকালে অভিযোগটা বেগা বেগমের পক্ষ থেকেই এসেছিল। সে বলল, কৈফিয়ত দেয়াটা ভুল করার চেয়েও অন্যায়। আমার অভিযোগ করার উদ্দেশ্যই ছিল যে আপনি যেন আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু আপনি বিষয়টিকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এখন কী ভাবে এর সমাধান হতে পারে? আপনি বাদশাহ আমাদের জানমালের রক্ষক আর আমরা নিতান্তই অবলা। এই কথা বলে বেগা বেগমও মুচলেকা লেখা কাগজ বাদশাহের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বাদশাহ বিষয়টিকে আর দীর্ঘ না করে ওখানেই ইতি টানলেন।

হিজরি ৯৪১-এর শা'বান মাসের চোদ্দো তারিখে বাদশাহ হুমায়ুন বাগ-এ-জর আফশাঁ থেকে গুজরাট অভিমুখে রওনা হন। বাদশাহের গুজরাট অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বিদ্রোহী সুলতান বাহাদুর শাহকে শায়েস্তা করা। মন্দসুর নামে এক জায়গাতে উভয় পক্ষের বাহিনী মুখোমুখী হল। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চম্পানিড়ের দিকে পালিয়ে গেলেন। বাদশাহের বাহিনী তাঁকে তাড়া করে চম্পানিড় পৌঁছাল। তখন বাহাদুর শাহ পালালেন আহমেদাবাদের দিকে। বাদশাহ তখন আহমেদাবাদে

AMARBOI.COM

এলাকাকেও বাহাদুর শাহের কবলমুক্ত করেন এবং সম্পূর্ণ গুজরাট দখল করে নিজের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেন। মির্জা আসকরিকে দেন আহমেদাবাদ। কাসিম হোসেন সুলতানকে ভরোচ এবং পাটন দেয়া হয় ইয়াদগার মির্জাকে। এরপর বাদশাহ কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে কমনবায়তের দিকে যাত্রা করলেন। কয়েকদিন পর জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আপনারা আলস্যে সময় কাটাচ্ছেন, ওদিকে কমনবায়তের লোকেরা গোপনে গোপনে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং শীঘ্রই বাদশাহের উপরে হামলা চালাবে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়সওয়ার সৈন্য পাঠান। বাদশাহের আমির ওমরাহেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওই দলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় সকলকেই বন্দি করে ফেলে। বন্দিদের অধিকাংশকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এখান থেকে বাদশাহ হুজুর বরোদা চলে যান তারপর ওখান থেকে চম্পানিড়।

চম্পানিড়ে আমরা বেশ ছিলাম। হঠাৎই কেমন একটা ছন্দপতন ঘটে গেল। মির্জা আসকরির লোকেরা এসে জানাল যে মির্জা আসকরি এবং মির্জা ইয়াদগার নাসের, দুজনে মিলিতভাবে আগ্রার দিকে রওনা হয়েছেন। গুজরাটের শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে অসমাপ্ত রেখেই বাদশাহও আগ্রা রওনা হন। আগ্রায় পৌঁছে ওখানেই নিশ্চিন্তে এক বছর কাটিয়ে দেন। এরপর তিনি চিনাদা যান এবং একসঙ্গে বেনারস ও চিনাদা জয় করেন।

ইতিমধ্যে শেরখানের কাছ থেকে একটা আবেদন এল যে আমি আপনাদেরই পুরানো এক খাদিম। যে কোনো একটা সীমা নির্ধারণ করে আমাকে দিন আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আলা হজরত শেরখানের আবেদন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলেন, এমন সময় খবর এল যে, বাংলাদেশে বিদ্রোহীদের হামলায় সেখানকার শাসনকর্তা জখম হয়ে রাজধানী পালিয়েছেন। শেরখানের আবেদন সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া আর হয়ে উঠল না। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ শাহিফৌজ নিয়ে বাংলার দিকে রওনা হলেন।

যে মুহূর্তে শেরখান জানতে পারল যে বাদশাহ গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তিনিও তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁর পুত্রের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। শেরখানের পুত্র এবং অন্যতম অনুগত সেনানায়ক খাওয়াস খান এই সময় গৌড়ে ছিলেন। শেরখান তাঁর পুত্র এবং খাওয়াস খানকে নির্দেশ দিলেন যে তারা প্রয়োজনে কিছুটা পশ্চাদাপসরণ করে তাদের অবস্থানকে যেন সুদৃঢ় করে। শেরখানের পুত্রের সৈন্যবাহিনী পিছিয়ে গিয়ে গড়হিতে নিজেদের সংযত করল।

বাদশাহ হুমায়ুন শাহি ফৌজের অন্যতম সেনানায়ক জাহাঙ্গির বেগকে লিখলেন, তিনি যেন আরও কয়েক কদম এগিয়ে গড়হিতে পৌঁছে যান। জাহাঙ্গির বেগ বাদশাহের নির্দেশ মতো গড়হিতে গিয়ে আক্রমণ হানলেন। যুদ্ধে জাহাঙ্গির বেগ গুরুতর জখম হন এবং তাঁর বহু সৈন্য নিহত হয়। আলা হজরত বাদশাহ তখন কোঘলগানুতে ছিলেন। গড়হির খারাপ অবস্থার সংবাদ পেয়ে তিনি গড়হি যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। বাদশাহ গড়হিতে পৌঁছানোমাত্র শেরখান ও খাওয়াস খান অন্ধকার রাত্রির সুযোগ নিয়ে গড়হি থেকে পালিয়ে গেল। গড়হি থেকে বাদশাহ গৌড় বাংলায় আসেন এবং তা অধিকার করেন।

এই দূরাঞ্চলের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে বাদশাহ নয় মাস কাল অবস্থান করেন। গৌড়ে

www.amarboi.com



তার দিন ভালোই কাটছিল। এমন সময় খবর এল কিছু আমির ওমরাহের দল বাদশাহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মির্জা হিন্দালের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে। খসরু বেগ, জাহেদ বেগ, সৈয়দ আমির মির্জা হিন্দালের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বলে যে, বাদশাহ যেহেতু এখন বহুদূরে অবস্থান করছেন। সেজন্য মির্জাদের দলের মোহাম্মদ সুলতান মির্জা এবং তাঁর দুই পুত্র উলুগ মির্জা ও শাহ মির্জা আবার বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছে এবং সেই মতো ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে। আবার ঠিক এমনই সময় খবর এল যে শেখ বহলুল জররা, বখতর অঞ্চলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়ার শলাকা শেরখান ও বিদ্রোহী মির্জাদের সরবরাহ করার জন্য মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে।

মির্জা হিন্দাল একথা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তিনি মির্জা নুরুদ্দিনকে ঘটনার সত্যাসত্য বিচারের জন্য নিয়োগ করেন। নুরুদ্দিন তদন্ত করে জানালেন যে ঘটনা সত্য। এরপর মির্জা হিন্দাল বন্দেগি শেখ বহলুলকে হত্যা করে ফেললেন। এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ বাদশাহের কাছে পৌঁছাতেই তিনি আগ্রা রওনা হলেন।

বাদশাহ শাহি লোক লস্কর নিয়ে গঙ্গার ডান দিকের তট ধরে আসছিলেন। মুঙ্গেরের কাছাকাছি যখন তিনি পৌঁছলেন তখন আমির ওমরাহরা তাঁর কাছে আর্জি পেশ করল যে, আপনি বাদশাহ, সকলের উপরে। আপনি যে পথে গৌড় এসেছিলেন সে-পথেই আগ্রা ফিরে চলুন যাতে শেরখান না রটনা করতে পারে যে আপনি তার ভয়ে পথ পরিবর্তন করেছেন। এই কথামতো হজরত বাদশাহ স্থলপথে মুঙ্গের যাত্রা করেন এবং পুরুষ আত্মীয় পরিজনদের নৌকাযোগে পাটনার কাছে-হাজিপুরে পাঠান। তিনি যখন বাংলার সরহদ (সীমানা) অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছান, সেখানে তিনি কাসেম হোসেন সুলতানকে রেখে যান। এসময় খবর পাওয়া গেল যে শেরখানও খুব কাছাকাছিই আছে। এ যাবৎ শেরখান ও শাহি ফৌজের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলোতেই শেরখান পরাজিত হয়েছেন। এই সময় বেগা বেগম জৌনপুর থেকে, মিরাক বেগ চিনাদা থেকে এবং মোগল বেগ অবধ থেকে এসে বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হন। এদের আসার ফলে ওই অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়।

এটা শেরখানের প্রতি খোদাতালার অনুগ্রহই বলতে হবে কারণ যখন শাহি ফৌজ কিছুটা অপ্রস্তুত সেই অবস্থায় শেরখান হামলা করে এবং শাহি ফৌজ এই প্রথম পরাজিত হল। অনেক লোক বন্দি হয় এবং স্বয়ং বাদশাহের হাতেও আঘাত লাগে। বাদশাহ তিনদিন চিনাদায় থাকেন তারপর আড়িয়ালের নদীর পারে এসে ওপারে যাবার কথা ভাবতে থাকেন। নদী কী ভাবে পার হবেন ভেবে যখন আকুল, তখন স্থানীয় এক রাজা পাঁচ-ছটি সওয়ারি নৌকা নিয়ে সেখানে হাজির হন এবং বাদশাহকে ওপারে পৌঁছে দেন। শাহি ফৌজের লোকজন প্রায় চার-পাঁচদিন ধরে অভুক্ত ছিল। রাজা তাদের অবস্থা দেখে একটা বাজার বসাবার ব্যবস্থা করলেন। এবার সৈন্যদের কয়েকটা দিন বেশ আরামে কাটল। বাজারে ঘোড়ার দামও বেশ সস্তা ছিল। যুদ্ধে যারা ঘোড়া হারিয়েছে তারা এখান থেকে ঘোড়া কিনে নিল। মোটকথা রাজা শাহি ফৌজ এবং বাদশাহের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার এবং যথাসম্ভব সহযোগিতা করেন। পরদিন বাদশাহ রাজাকে বিদায় জানালেন এবং জৌহরের


AMARBOI.COM

নামাজের সময় স্বাভাবিক ভাবে পায়ে হেঁটে সৈন্যরা যমুনার তীরে পৌঁছান। নদীর একটা সংকীর্ণ অঞ্চল সৈন্যরা পায়ে হেঁটে পার হল। এরপর বাদশাহ কোররাতে পৌঁছান। এখানে খাদ্যদ্রব্য এবং ভোগ্যপণ্য খুব সুলভ ছিল। এলাকাটা বাদশাহের শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যেই ছিল। সৈন্যরা এখানে বেশ আরামে আয়েশে দিন কাটাল। এখান থেকে বাদশাহ কালপি আসেন এবং সেখান থেকে আগ্রার দিকে যাত্রা করেন।

গঙ্গার ডান তীর ধরে আগ্রার পথে চলার সময়ই বাদশাহ সংবাদ পেলেন যে শেরখান চুসা পৌঁছে গেছে। শাহি ফৌজের সৈন্যরা এ খবর শুনে একেবারে অবাক। ওদিকে পিছনে যে সৈন্যরা চুসার দিকে আসছিল তাদের কাছে কিন্তু এই খবরটা পৌঁছায়নি। সুলতান হোসেন মির্জার কন্যা আয়েশা সুলতানম বেগম, শাহবাবার (বাবুর) খলিফা বাচকাকা, বেগা জান কোকা সঙ্গে বাদশাহের কন্যা আকিকা বেগম, তখন তার বয়স মাত্র ছয় বছর, চান্দ বিবি তখন তিনি সাত মসের সন্তানের জননী এবং শাদবিবি। এই তিনজনেই ছিলেন বাদশাহ হুমায়ুনের বেগম। এদের কোনো খবরই পাওয়া যায়নি। এঁরা নদীতে ডুবে মরেছেন না অন্য কোনো বিপদে পড়েছেন সে সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করেও কিছুই জানা যায়নি। হজরত বাদশাহও অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চল্লিশ দিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।

খসরু বেগ, দেওয়ান বেগ, জাহেদ বেগ এবং সৈয়দ আমির, বাদশাহের আগেই এখানে এসে পড়েছিল। এরপর সংবাদ এল যে মির্জাগণ মোহাম্মদ সুলতান মির্জা ও তাঁর পুত্ররা কনৌজ পৌঁছে গিয়েছিলেন।

শেখ বহলুলের হত্যার পর মির্জা হিন্দাল দিল্লি চলে যান। তিনি মির ফক্কর আলি এবং অন্যান্য কয়েকজনকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল মির্জাদের মধ্যে ভাঙন ধরানো। বাধ্য হয়ে অন্যান্য মির্জারা কনৌজে পালিয়ে চলে আসে। মির ফক্কর আলি মির্জা ইয়াদগার নাসেরকেও দিল্লিতে এনেছিলেন। মির্জা হিন্দাল এবং ইয়াদগার নাসেরের মধ্যে কোনো দিনই সদ্ভাব না থাকায় মির ফক্কর আলির ইয়াদগারকে দিল্লিতে আনাটা ভুল হয়ে যায়। মির্জা হিন্দাল এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে দিল্লি অবরোধ করেন।

মির্জা কামরান যখন এখবর শুনলেন তখন তাঁর মনেও ক্ষমতার অর্থাৎ বাদশাহ হবার বাসনা জেগে উঠল। বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনিও দিল্লির দিকে যাত্রা করলেন। এই অশ্বারোহী সৈন্যদল দিল্লি পৌঁছানোর আগেই মির ফক্কর আলি এবং মির্জা ইয়াদগার দিল্লি শহরের সব কটা দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়। তিনদিন পর মির ফক্কর আলি মির্জা কামরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে বলেন যে এখন বাদশাহের সঙ্গে শেরখানের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, মির্জা ইয়াদগার নাসের আপনার কাছে ইচ্ছা করেই আসেননি। এই গোলমেলে পরিস্থিতিতে আপনার উচিত হবে কোনোভাবে মির্জা হিন্দালকে গ্রেফতার করে আগ্রা নিয়ে যাওয়া। দিল্লিতে থাকার চিন্তা ত্যাগ করাই ভালো।

মির্জা কামরান মন দিয়ে মির ফক্কর আলির পরামর্শ শুনলেন এবং তাঁকে আপাদমস্তক সম্মানসূচক খেলাত (রাজদত্ত পরিচ্ছদ) পরিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি মির্জা হিন্দালকে বন্দি করেন এবং সসৈন্যে আগ্রা রওনা হন। আগ্রা পৌঁছে মির্জা কামরান মহান



বাদশাহ বাবুরের সমাধিতে প্রার্থনা করেন এবং মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীদের সঙ্গে বাগ-এ-গুল আফশাঁতে বাস করতে থাকেন।

এরকম অবস্থায় নূরবেগ নামে একজনের মারফত মির্জা কামরান জানতে পারলেন যে আলা হজরত বাদশাহ হুমায়ুন আগ্রা আসছেন। মির্জা হিন্দাল বহলুল শেখকে হত্যা করেছিলেন। এখন যদি বাদশাহ তাঁকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কী কৈফিয়ত দেবেন এই ভেবে মির্জা হিন্দাল আলোয়ারের দিকে পালিয়ে গেলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন আগ্রায় আসার বেশ কয়েকদিন পর মির্জা কামরান বাগ-এ-গুল আফশাঁ থেকে বাদশাহের খিদমতে এসে উপস্থিত হন। ওই দিনই সন্ধ্যায় আমরা সকলেই বাদশাহের দরবারে জমায়েত হয়েছিলাম। বাদশাহ প্রথমে আমার দিকে এক নজর দেখে বললেন, গুলবদন! তোমাকে তো আমি চিনতেই পারিনি। আমি যখন গৌড়ে যাই তখন তুমি এক ধরনের বেশভূষা পরতে আর এখন পরেছ ঢোলা পোশাক (লচক কাসাবা — বিবাহিত নারীরা পরে) এজন্য চিনতে একটু অসুবিধা হয়েছে। তবে গৌড়ে থাকার সময়ও তোমার কথা মনে পড়ত আর ভাবতাম কেন তোমাকে সঙ্গে আনিনি। কিন্তু যখন যুদ্ধের প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে পড়ে যাই এবং পরাজিত হই তখন খোদাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এই বলে যে অন্তত তোমাকে আমি সঙ্গে আনিনি। আমার কন্যা আকিকা, কতটুকুই বা বয়স ছিল তার। কেন যে আমি তাকে যুদ্ধের মধ্যে নিয়ে গেলাম।*

কিছুদিন পর বাদশাহ হুজুর মাননীয়া জননীকে দেখতে এলেন। এবার তাঁর হাতে ছিল কোরানে পাক। তিনি সকলকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যেতে নির্দেশ করলেন। শুধু কক্ষ মধ্যে ছিলাম আমি, দিলদার বেগম, আফগানি আগাচা, গুলনার আগাচা, নারগুল আগাচা এবং আমার মাতা। আমাদের তিনি বললেন, হিন্দাল আমার জীবনে এক প্রেরণা। সে আমার দুচোখের নূর আমার বাহুবল। তাকে আমি খুবই স্নেহ করি। সে যা করে ফেলেছে তার আর কোনো প্রতিষেধক নেই। শেখ বহলুলের দুঃখজনক অন্তের জন্য এখন আর হিন্দালকে দোষী সাব্যস্ত করে কী হবে। যা ছিল খোদার মর্জি, তাই হয়েছে। মির্জা হিন্দাল সম্বন্ধে আমার মনে এখন আর কোনো রোষ বা ক্ষোভ নেই। যদি আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে না পারেন, সেজন্যই আমি কোরান শরিফ নিয়ে এসেছি, যা স্পর্শ করে আমি এই কথাগুলিই বলব। জননী দিলদার বেগম এবং আমি বাদশাহের হাত থেকে কোরান শরিফ এক প্রকার ছিনিয়েই নিলাম এবং সকলে এক সঙ্গে বললাম, আপনার আদেশ মতেই সব কিছু হবে সেজন্য পবিত্র কোরান ছোঁয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মহানুভব বাদশাহ আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'গুলবদন তুমি যদি গিয়ে হিন্দালকে আমার কাছে নিয়ে আসো, তাহলে ভালো হয়।' মাতা দিলদার বেগম বললেন, 'গুলবদন এখনও ছোটো। তাছাড়া সে একা একা কোথাও কখনও যায়নি, এই কাজের দায়িত্ব নেওয়া ওর পক্ষে গুরুভার হয়ে যাবে না কি? আপনি অনুমতি করলে আমি নিজে এর জন্য যেতে পারি।' শুনে বাদশাহ বললেন, 'আমার প্রকৃত ইচ্ছা কিন্তু ছিল এই যে আপনি স্বয়ং

* এই যুদ্ধে বাদশাহ হুমায়ুনের দুই পত্নী ও ছয় বছরের এক কন্যার মৃত্যু হয় এবং এক পত্নী শেরশাহের হাতে বন্দি হন।

AMARBOI.COM

হিন্দালকে আনতে যান। পুত্রকন্যাদের বিপদের দিনে পিতামাতাদেরই উচিত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বলভরসা জোগানো। আপনি জননী, আপনি নিজে এই কাজের দায়িত্বভার নিলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

মাতা দিলদার বেগম আমির আবুল বকাকে নিয়ে মির্জা হিন্দালকে ফিরিয়ে আনার জন্য আলোর রওনা হলেন। এদের আসার সংবাদ পেয়ে হিন্দাল নিজেই ছুটে এলেন এবং মাতাকে কদমবুসি করলেন। এরপর মির্জা হিন্দাল জননী দিলদার বেগমের সঙ্গে আগ্রা আসেন এবং বাদশাহের খিদমতে হাজির হন। শেখ বহলুলের অন্তিম পরিণতির প্রশ্নে তিনি নিজের পক্ষে অনেক যুক্তি দেন এবং বলেন, সে অর্থাৎ বহলুল শেখ গোপনে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়ার জিন ইত্যাদি বিদ্রোহী শেরখানকে সরবরাহ করেছে, উপযুক্ত তদন্ত করেই আমি এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হই এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দিই।

ইতিমধ্যে খবর এসে গেল যে শেরখান লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত অধিকার করে ফেলেছে। এই সময় একজন ভিস্তিকে (জলবাহক) সর্বদা বাদশাহের সঙ্গে দেখা যেত। এই ভিস্তি এক নিদারুণ বিপদের মুহূর্তে বাদশাহের প্রাণরক্ষা করেছিল। চুসা অঞ্চলের যুদ্ধে বাদশাহের ঘোড়া নিহত হয়, প্রাণ বাঁচাতে বাদশাহ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। তখন এই ভিস্তি তার মশক দিয়ে বাদশাহকে রক্ষা করেছিল। তার মশকের সাহায্য না পেলে বাদশাহ নদীতে হয়তো ডুবেই যেতেন। এই কাজের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ তাকে পুরস্কার স্বরূপ আগ্রার সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন। এই ভিস্তিটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমি জানতাম না। কেউ কেউ তার নাম বলত নিজাম আবার কেউ বলত সম্বল। হজরত বাদশাহের অমূল্যজীবন রক্ষার পুরস্কার হিসাবে সে সিংহাসনে বসার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিল। বাদশাহ দরবারের সমস্ত আমির ওমরাহদের বলে দিয়েছিলেন যে তাঁরা বাদশাহকে যেমন মর্যাদা দিয়ে সালাম জানান, কুর্নিশ করেন, ভিস্তি নিজাম যখন সিংহাসনে আসীন হবেন তখন তাকেও যেন অনুরূপভাবেই সম্মান দেখান। গোলাম নিজাম সিংহাসনে বসে খুব দান খয়রাত ও পদ প্রদান করে। তার বাদশাহী দুদিন স্থায়ী হয়েছিল। এই দুদিন মির্জা হিন্দাল হাজির হননি। তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্য আবার আলোর চলে যান। মির্জা কামরানও দরবারে আসেননি। অসুস্থ ছিলেন। তবে ভিস্তিওলা নিজামকে সিংহাসনে বসানোয় তিনি যারপরনাই অখুশি ছিলেন। তিনি বাদশাহকে বলেছিলেন যে, লোকটি যত উপকারই করে থাকুক না কেন, তার জন্য তাকে সিংহাসনে বসানো উচিত হয়নি। তাকে অন্য কোনো পুরস্কার কিংবা জায়গির দেওয়া যেত। বিশেষত শেরখান যখন ক্রমশই আগ্রার দিকে এগিয়ে আসছে তখন এই সব বালসুলভ কাজকর্মের কোনো অর্থ হয় না।

এসময় মির্জা কামরানের ব্যাধি দিনের পর দিন বেড়ে চলতে থাকে। তাঁর শরীর এত দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁকে প্রায় চেনাই যেত না। বাঁচার আশা সকলে এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু খোদাতালার অসীম অনুগ্রহে মির্জা কামরান ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে বাদশাহের পরামর্শ ক্রমে তাঁর মায়েরা, তাঁর খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছেন। কথাটা যখন বাদশাহ হুজুরের কানে গিয়ে উঠল, তখন বাদশাহ নিজে মির্জা কামরানের কাছে এলেন এবং কোরানের কসম খেয়ে



বললেন এরকম হীন ষড়যন্ত্রের কথা কোনো দিন তিনি ভাবেনওনি এবং এরকম করার জন্য কাউকে কোনো নির্দেশ তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও দেননি। বাদশাহ শপথ করে বলার পরও কিন্তু মির্জা কামরানের ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আবার তাঁর রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় এমন অবস্থা হয় যে তাঁর বাকশক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে যায়।

এদিকে সংবাদ এল যে শেরখান এবার লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আরও এগিয়ে আসছে। বাদশা হুমায়ুন, কামরানকে আগ্রার শাসনভার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে কনৌজের দিকে এগিয়ে গেলেন শেরখানকে প্রতিরোধ করতে।

আগ্রায় বসে মির্জা কামরান সংবাদ পেলেন যে বাদশাহ নৌকা দিয়ে সেতু তৈরি করে লোক-লস্কর নিয়ে নদী পার হতে সক্ষম হয়েছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মির্জা কামরান আগ্রা ছেড়ে লাহোরের দিকে রওনা দেন। যাবার সময় মির্জা কামরান আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমাকেও তাঁর সঙ্গে লাহোর যেতে হবে। আমার মনে হল যে তিনি বোধহয় বাদশাহকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি (কামরান) অসুস্থ, আমাকে দেখাশোনা করার মতো কেউ লাহোরে নেই। এই অবস্থায় আপনি যদি অনুগ্রহ করে গুলবদনকে আমার সঙ্গে লাহোরে আসার অনুমতি দেন তাহলে খুবই ভালো হয়। বাদশাহ হয়তো তাঁর অনুরোধেই আমাকে তাঁর সঙ্গে লাহোর যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। বাদশাহ লক্ষ্ণৌর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা সংবাদ আসতেই মির্জা কামরান শাহি ফরমানের মতো আমাকে আদেশ করলেন, 'গুলবদন তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে লাহোর যাবে।' আমার মা মির্জা কামরানকে বললেন, 'গুলবদন এযাবৎ কাল কখনোই আমাদের ছেড়ে একাকী থাকেনি।' শুনে মির্জা কামরান বললেন, 'যদি গুলবদন একা যেতে না চায় তাহলে আপনিও চলুন। কিন্তু যেতে হবেই।'

মির্জা কামরান পাঁচশত সৈন্য, মাহুত সহ হাতি এবং একদল দেহরক্ষী পাঠিয়ে আমাকে নিতে এলেন। আমার আপত্তি দেখে মির্জা কামরান বলে পাঠালেন যে, 'লাহোর পর্যন্ত যদি যেতে না চাও ঠিক আছে। তবে কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে তোমাকে যেতেই হবে।'

অবশেষে লোক-লস্কর নিয়ে যখন রওনা হলাম, তখন মির্জা কামরান প্রতিজ্ঞা করে বললেন, তোমাকে আর আমি ফিরে যেতে দেব না। আমি যথেষ্ট প্রতিবাদ এমনকি কান্নাকাটিও করলাম কিন্তু মির্জা কামরানের মতের পরিবর্তন হল না। আমার গর্ভধারিণী জননী, অন্যান্য ভগিনীরা, পৈত্রিক আমলের ভৃত্য, খিদমতগার, শৈশবের খেলার সঙ্গী, যাদের মধ্যে থেকেই আমি আজ এত বড়ো হয়েছি—তাদের সকলের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে মির্জা কামরান আমাকে লাহোরে নিয়ে চললেন। পরে আমি জানতে পারি যে বাদশাহ সালামতের নির্দেশও ওরকমই ছিল। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানিয়ে বললাম, যে আমি কখনোই এরকম আশা করিনি যে আপনি আমার প্রতি এরকম কঠোর হবেন এবং আপনার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে মির্জা কামরানের হাতে সোপর্দ করবেন।

আমার এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে বাদশাহ আমাকে অনেক শুভ কামনা জানালেন

AMARBOI.COM

এবং বললেন, আমার কাছ থেকে তোমাকে সরিয়ে দিতে কখনোই আমার মন সায় দেয়নি, কিন্তু মির্জা কামরান এজন্য আমার কাছে ভীষণভাবে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। সে তোমাকে লাহোরে নিয়ে যাবার জন্য এমনভাবে আমাকে বলতে থাকে যে আমার পক্ষে 'না' বলা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আমার এখন থাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। সর্বত্রই যুদ্ধ চলছে, খোদার অনুগ্রহে যুদ্ধ থামলেই তুমি আবার আমার কাছে চলে আসবে।

মির্জা কামরান তার লোক লস্কর নিয়ে লাহোরের দিকে রওনা হতেই আগ্রার বেশিরভাগ আমির ওমরাহ, অবস্থাপন্ন বণিক, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নাগরিকরাও তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মির্জা কামরানের কাফেলার সঙ্গে লাহোর পাঠিয়ে দেন।

লাহোর পৌঁছে খবর পেলাম যে গঙ্গার তীরে বাদশাহের সঙ্গে শেরখানের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে এবং যুদ্ধে শাহি ফৌজের হার হয়েছে। একটাই সুখবর যে এই বিপদের মধ্যেও আলা হজরত তাঁর ভাই ও পরিজনদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সশরীরে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই সংবাদ আসার পর বাদশাহের অন্যান্য আত্মীয় পরিজন, যারা তখনও আগ্রাতে ছিলেন, তারাও আলোর কিংবা লাহোরের দিকে রওনা হন।

এসময় বাদশাহ হুমায়ুন মির্জা হিন্দালকে বললেন, আগেরবারের যুদ্ধের সময় আমার কন্যা আকিকা বিবিকে আমি হারিয়েছি, আজও আমি সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমার এখন মনে হয় এর থেকে আমি যদি আমার বেগম এবং কন্যা, যারা শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছিল তাদের নিজের হাতে হত্যা করতাম, তাহলে হয়তো আমাদের বংশের গায়ে এই কালিমা লাগত না। এই যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোকদের নিয়ে যাতায়াত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। মির্জা হিন্দাল বললেন, নিজেদের মা ও ভগিনীদের নিজের হাতে হত্যা করা কত যে বেদনাদায়ক তা বাদশাহ নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারেন। আমার দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্তও থাকবে ততক্ষণ আমি আমাদের শাহি পরিবারের মাতা ভগিনীদের রক্ষা করে যাব। খোদার কাছে আমার এটুকু আর্জি তিনি যেন আমাকে সেই শক্তি প্রদান করেন যার সাহায্যে আমি আমার শাহি পরিবারের মান মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। এরপর বাদশাহ মির্জা আসকরি, মির্জা ইয়াদগার নাসের এবং আরও যে সমস্ত আমির ওমরাহ যুদ্ধ থেকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে পেরেছেন তাদের নিয়ে ফতেপুর যাত্রা করেন। এদিকে মির্জা হিন্দাল মাতা দিলদার বেগম, ভগিনী গুলচেহারা বেগম, আফগানি আগাচা, গুলনার আগাচা, নারগুল আগাচা এবং তারা অন্যান্য আত্মীয় পরিজন এবং কিছু আমির ওমরাহদের নিয়ে আলোর যাত্রা করেন। পথে তাঁরা একদল দস্যুদের সম্মুখীন হন ও তাদের দ্বারা নানাভাবে বিপর্যস্ত হন এবং তারা সৈন্যদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়।

মির্জা হিন্দাল অবশেষে এই দস্যুদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বিপক্ষের একটি তির এসে মির্জার অশ্বকে আঘাত করে। এরপর উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং মির্জা হিন্দাল দস্যুদের হাত থেকে শাহিপরিবারের রমণীদের উদ্ধার করেন। আমার সম্মানীয়া জননী এবং অন্যান্য ভগিনীরা এবং অন্যান্য আমির ওমরাহ অবশেষে প্রাণ বাঁচিয়ে আলোর পৌঁছাতে সমর্থ হন। এরপর আলোর থেকে তাঁবুর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র সংগ্রহ করে লাহোরের পথে যাত্রা করেন।



বাদশাহ হুমায়ুন যতদিন লাহোরে ছিলেন ততদিন প্রতি নিয়ত শের খানের অগ্রগতির খবর আসত। প্রতিদিনই শোনা যেত যে আজ শেরখান এতটা এগিয়েছেন ইত্যাদি। অবশেষে একদিন সংবাদ মিলল যে, তিনি সেরহিন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।

বাদশাহের ওমরাহদের মধ্যে মোজাফ্ফর বেগ নামে একজন ছিলেন। বাদশাহ তাঁর এবং কাজি আবদুল্লার মারফত শেরখানকে বলে পাঠালেন যে, 'তুমি আমাদের উপরে কি কারণে এত অত্যাচার করছ? সম্পূর্ণ হিন্দুস্থান আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি শুধু লাহোর অঞ্চল আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি এখন সেরহিন্দ পর্যন্ত পৌঁছে গেছ, এখন সেটাই হোক তোমার ও আমার অঞ্চলের সীমানা।'

কিন্তু এই নিষ্ঠুর, শয়তান প্রকৃতির লোকটি বাদশাহের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পালটা প্রস্তাব পাঠায়, 'আমি তোমাকে কাবুল ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার সেই ভূমিতেই ফিরে যাও।'

মোজাফ্ফর বেগ শেরখানের জবাবী বার্তা নিয়ে দূত লাহোরে ফিরে এলেন। তবুও যাতে শাহানশাহর কাছে খবরটি আরও আগে পৌঁছানো যায় সেজন্য একজন দ্রুতগামী কাসেদ পাঠালেন। কাসেদ এসে বাদশাহকে শেরখানের বার্তা নিবেদন করে বলল, হুজুর মালিক, আমাদের এক্ষুনি লাহোর ত্যাগ করতে হবে। বাদশাহ লাহোর ত্যাগের ব্যবস্থা করতে বলেন। লাহোর ছাড়ার দিনটি যেন ছিল কেয়ামতের দিন। শেরখানের আক্রমণের ভয়ে, সুসজ্জিত বাড়িঘর, জিনিসপত্র ছেড়ে শুধু নগদ যা কিছু ছিল তাই নিয়ে লাহোর থেকে চলে যাওয়া হল। রাভি অতিক্রম করার পরই যেন সকলে শান্তির শ্বাস নিতে পারল।

বাদশাহের সমস্ত সহযাত্রীরাই রাভি (ইরাবতী) নদীর ওপারে পৌঁছে থাকার জন্য তাঁবু ফেলে। এখানেই শেরখানের দূত বাদশাহের সমীপে হাজির হয়। বাদশাহ পরদিন দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এরকম খবর পাঠালেন। মির্জা কামরান এসে বাদশাহকে বললেন, আগামী কাল দরবারে যখন শেরখানের দূত আপনার কাছে আসবে, তখন আমি মসনদে আপনার পাশে বসার অনুমতি প্রার্থনা করব, কারণ আমি দূতকে দেখাতে চাই যে, আমাদের ভাইদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, আমরা ঐক্যবদ্ধ।

হামিদাবানু বলেছেন যে মির্জা কামরানের ওই অনুরোধের উত্তরে এক চরণ রুবাই লিখে তাঁর কাছে পাঠান। কিন্তু আমি শুনেছি যে, ওই রুবাই বাদশাহ শেরখানের উদ্দেশেই লিখেছিলেন এবং তাঁর দূত মারফত সেটা তাকে পাঠিয়েও ছিলেন।

দর আইনা গারচে খোদ নোমাই বাসদ
পায়ওয়াস্তা যে খেশতান জুদাই বাসদ
খোদরা বেমেসালি গায়ের দিদন আজরআস্ত
ইঁবুয়াল আজবি কারে খোদায়ে বাশদ

অর্থাৎ—আয়নাতে লোকে নিজের প্রতিবিম্বই দেখতে পায়। কিন্তু এই প্রতিবিম্ব আর আসল মানুষটি কিন্তু কখনোই এক নয়। এটা খুবই বিস্ময়ের যে মানুষ নিজেকে অন্যরূপে দেখে। কিন্তু এই বিস্ময়ও খোদারই মর্জি।

AMARBOI.COM

পরেরদিন শেরখানের দূত যথারীতি এসে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হল। বাদশাহ ওই সময় খুবই চিন্তিত এবং শোকগ্রস্ত ছিলেন। মনের মধ্যেকার অধৈর্য ভাব দূর করার জন্য তিনি আফিম খেয়ে নেশাগ্রস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ আর বসার অবস্থায় ছিলেন না, শুয়ে পড়েন। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন একজন সুপুরুষ আপাদমস্তক সবুজ পোশাকমণ্ডিত তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার হাতে দীর্ঘ এক যষ্ঠি। স্বপ্নের সেই পুরুষ তাঁকে লক্ষ করে বলছেন, 'হতাশ হয়ো না, নিজের মধ্যেকার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত করো এবং সমস্ত ভাবনা খোদার প্রতি সমর্পণ করো।' একথা বলার পর সেই পুরুষ তাঁর হাতের যষ্ঠিটি বাদশাহের হাতে স্পর্শ করে আবার বললেন, 'খোদা অচিরেই তোমাকে এক পুত্র সন্তান দান করবেন। আর তার নাম রেখো, জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর।'

হজরত বাদশাহ ওই মহান পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আমার নাম জেন্দা ফিল আহমদ জাম, তোমার ওই পুত্র হবে আমার বংশজাত।' এই সময় বেগম গুনুর গর্ভবতী ছিলেন, সকলেই ভাবল যে তাঁর গর্ভে এবার পুত্র সন্তানই জন্ম নেবে। কিন্তু জমাদিউল আউয়াল মাসে বাগ-এ-মুনসিতে বেগম গুনুর এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় বানু বেগম।

এবার বাদশাহ মির্জা ওয়াহিদকে পাঠালেন কাশ্মির আক্রমণ করতে। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গেল শেরখান এদিকেও আসছে। আবার সেই অনিশ্চয়তা আর বিশৃঙ্খলা। সিদ্ধান্ত হল পরদিনই এই জায়গাও ছাড়তে হবে। বাদশাহের ইচ্ছা ছিল কাশ্মিরে যাবার। সেখানে আগেই মির্জা হায়দার কাশ্মিরিকে পাঠানো হয়েছে তারপর ওয়াহিদ মির্জাও গিয়েছেন। কিন্তু মির্জারা যে কাশ্মির জয় করতে পেরেছেন এমন কোনো সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সকলে বাদশাহকে পরামর্শ দিল যে আপনি যদি কাশ্মির চলে যান এবং কাশ্মির যদি এখনও জয় করা না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার অনুপস্থিতির সুযোগে শেরখান লাহোর দখল করে ফেললে তখন কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়বে এবং আমরা নিদারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে যাব।

খাজা কালা বেগ এসময় ছিলেন শিয়ালকোটে। তিনি বাদশাহের খিদমতে হাজির হবার জন্য সেখান থেকে রওনা হন। মুইদ বেগও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মুইদ বেগ এক আর্জি মারফত বাদশাহকে জানান যে খাজা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনার খিদমত করতে খুবই উৎসুক কিন্তু সে ভীষণ ভাবে মির্জা কামরানের দ্বারা প্রভাবিত। আপনি এই অঞ্চলে এলে মির্জা অবশ্যই আপনার খিদমত করবেন। বাদশাহ হুমায়ুন একথা শুনেই জররা পরে বক্কর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে সন্ধি করে খাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সঙ্গে করেই ফিরে আসেন।

বাদশাহ অতঃপর জানালেন যে তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে বদখসান চলে যাবেন এবং কাবুলকে মির্জা কামরানের হাতে তুলে দিয়ে যাবেন। কিন্তু মির্জা কামরান কাবুল যেতে সম্মত হলেন না। বললেন, আমাদের মহান পিতা সম্রাট বাবুর এই কাবুল আমার গর্ভধারিণী জননীকে দিয়েছিলেন, এই কারণেই আমি কাবুল নিতে পারব না। বাদশাহ বললেন, কাবুল



সম্বন্ধে মরহুম পিতা মহান বাদশাহ বাবুর বলতেন যে এই কাবুল আমি কাউকেই দেব না। আমার পুত্রেরা কেউ যেন এই কাবুলের প্রতি লোভ না করে। কারণ এই কাবুলেই আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার পুত্র কন্যাদের পেয়েছি। এই কাবুল থেকেই আমার বিজয় যাত্রা সাফল্যের মুখ দেখেছে। মহান পিতা তাঁর লিখিত 'তুজুক-এ-বাবুরি'-তে এর স্বপক্ষে অনেক কথা লিখেছেন। সেই জন্যই মানবতার মুখচেয়ে এবং অনুগ্রহ করার জন্যই মির্জা কামরানকে কাবুল দিতে চেয়েছিলাম অথচ এখন সে অন্য সুরে কথা বলছে। হজরত বাদশাহ মির্জা কামরানকে অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু মির্জা কিছুতেই নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। বাদশাহ দেখলেন যে মির্জা কামরান এখানে পূর্ণ শক্তি নিয়ে উপস্থিত এবং কোনো ভাবেই তিনি বাদশহের অনুরোধ রাখবেন না তখন তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়ে ভক্কর ও মুলতানের দিকে যাত্রা করলেন।

মুলতানে এসে একদিন সেখানে কাটালেন। সঙ্গে যা কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করে একটি নদীর তীরে এসে থামলেন। স্থানটি প্রকৃত পক্ষে ছিল সাতটি নদীর সঙ্গমস্থল। বাদশাহ নদী পার হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাছাকাছি একখানা নৌকারও দেখা মিলল না। অথচ বাদশাহের সঙ্গে অনেক সৈন্য সামন্ত রয়েছে, সবকিছু নিয়ে নদী পার হওয়াও বিশাল ব্যাপার। এদিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে শেরখানের সেনাপতি খাওয়াস খান সসৈন্যে বাদশাহকে ধরতে আসছে। বাদশাহ যে অঞ্চলে ছিলেন, সেই অঞ্চলটি ছিল বখশু নামের এক বেলুচি জায়গিরদারের অধীন। বাদশাহ কয়েকজন লোকের সঙ্গে খেলাত, ঘোড়া এবং আরও নানা ধরনের উপঢৌকন বখশুকে পাঠালেন এবং বিনিময়ে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা প্রার্থনা করলেন। বখশু বেলুচি খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করে একশো নৌকা বাদশাহর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ নৌকা এবং খাদ্যদ্রব্য পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। খাদ্যবস্তু সকলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নৌকায় চড়ে নির্বিঘ্নে নদী পার হলেন। একে খোদার অনুগ্রহই বলতে হবে যা বিপদের সময় বখশু বেলুচি জায়গিরদারের মাধ্যমে বাদশাহের কাছে এসেছিল। এরপর বাদশাহ সদলবলে ভক্করে এসে পৌঁছালেন। ভক্করের দুর্গটির অবস্থান ছিল নদীর ঠিক মধ্যে। সুদৃঢ় এই দুর্গের পরিচালক ছিলেন সুলতান মাহমুদ খান। তিনি নিজেকে দুর্গের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দি করে রাখেন। বাদশাহ দুর্গের পাশের এক বাগিচায় শিবির স্থাপন করলেন। এই বাগিচাটি ছিল মির্জা শাহ হোসেন সমুন্দরের তৈরি।

বাদশাহ হুমায়ুন শাহ হোসেনের কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে বললেন, 'আমরা একরকম উপায়ন্তর না দেখে আপনার রাজত্বে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনার রাজ্য আপনার অধিকারেই থাকবে, এখানে কোনো রকম যুদ্ধ করার পরিকল্পনা আমাদের নেই। আপনি যথা নিয়মে শাহি দরবারে উপস্থিত হবার চেষ্টা করুন। আমরা গুজরাটের দিকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত করেছি, তখন এই অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে আপনার অধীনস্থ করে যাব।'

মির্জা হোসেন বাদশাহের এই বার্তা পেয়ে, তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধিতায় না গিয়ে ছলনার আশ্রয় নেন। বাদশাহকে তিনি এখানে নানা অজুহাতে চার-পাঁচমাস আটকে রাখেন। পরে এক কাসেদ (দূত) পাঠিয়ে বললেন, আমি আমার কন্যার নিকাহ নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

AMARBOI.COM

আপাতত একজন কাসেদ আপনার খিদমতে হাজির থাকবে, আমি পরে সময় মতো আসব। বাদশাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে আরও তিন মাস কাল এখানে অতিবাহিত করলেন। এই সময় বাদশাহ এবং তাঁর লোকজনদের খুবই কষ্টে কেটেছিল। খাদ্যদ্রব্য কখনও পাওয়া যেত আবার কখনও যেত না। ক্ষুধার জ্বালায় সৈন্যরা নিজেদের একান্ত প্রয়োজনের উট কিংবা ঘোড়া জবাই করেও খেয়েছে।

অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে বাদশাহ শেখ আবদুল গফুরকে শাহ মির্জা হোসেনের কাছে পাঠালেন এই বার্তা দিয়ে যে, 'আর কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তোমার আমার কাছে আসতে বাধা কোথায়? এদিককার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের, আমার পক্ষের লোকজন পালাতে আরম্ভ করেছে।'

প্রত্যুত্তরে শাহ মির্জা হোসেন জানালেন, 'মির্জা কামরানের সঙ্গে আমার কন্যার নিকাহের বাগ্‌দান হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আমি আপনার খিদমতে হাজির হতে পারি না এবং এখন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবার সময় হয়েছে, আমি আপনাকে সবিনয়ে জানাতে চাই যে, আমি আদৌ আপনার কাছে হাজির হব না।'

এসময় নদী পার হয়ে মির্জা হিন্দাল এদিকে এলেন। শোনা গেল যে তাঁর গন্তব্যস্থান কান্দাহার। এই সংবাদ জেনে বাদশাহ তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে মির্জা হিন্দাল সত্য সত্যই কান্দাহার যাচ্ছেন কি না। উত্তরে মির্জা জানালেন, একথা সর্বৈব মিথ্যা। সঠিক সংবাদ জানার পর আলা হজরত বাদশাহ মাতাকে দেখতে গেলেন। বাদশাহ পৌঁছাতেই মির্জা হিন্দালের হারেম ও অন্যান্য লোকজনেরা আলা হজরতকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হল। তাদের মধ্যে হামিদা বানুকে দেখে বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে? কী এর পরিচয়?' তাঁকে বলা হল যে এটি মির বাবা দোস্তের কন্যা। সেই সময় খাজা মোয়াজ্জেম কাছেই উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, 'হামিদা বানু আমার প্রণয়ী।'

এসময় প্রায়শই হামিদা বানুকে মির্জার মহলে যাতায়াত করতে দেখা যেত। পরদিন বাদশাহ হুজুর দ্বিতীয় বারের জন্য মাতার দর্শনে এলেন এবং বললেন, 'মির বাবা দোস্ত আমাদেরই আত্মীয়। আপনি হামিদা বানুর সঙ্গে আমার নিকাহের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' মির্জা হিন্দাল এর তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমি এই মেয়েটিকে নিজের কন্যা অথবা ভগিনীর মতো মনে করি। আপনি বাদশাহ, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, আপনার পক্ষ থেকে এরকম ব্যবহার মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই বিষয়টি নিয়ে অনেক গোলমাল হতে পারে।' শুনে বাদশাহ বেশ রেগে ওই স্থান ত্যাগ করেন।

এরপর আমার জননী বাদশাহকে এক পত্র লিখে বললেন, 'মেয়ের মা। মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, আর আপনি সামান্য কথা শুনেই ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন?' উত্তরে বাদশাহ জননীকে লিখলেন, 'আপনি এ বিষয়ে যা লিখেছেন, তা পড়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। আপনি যা বলবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব। খোরপোষের বিষয়েও আপনি যা বলবেন, সেটাই শিরোধার্য। আমি প্রতীক্ষায় রইলাম।'

এরপর মাতা বাদশাহের কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলেন। সেদিন খুব জোর আসর বসেছিল। আসর শেষ হলে বাদশাহ নিজের মহলে ফিরে যান। পরদিন আবার তিনি



আমার মায়ের কাছে এসে বললেন, 'কাউকে পাঠিয়ে হামিদা বানুকে ডাকা যায় না?' মাতা লোক পাঠালেন, কিন্তু হামিদা বানু এল না। উপরন্তু সে বলে পাঠাল, যদি বাদশাহকে সালাম করার প্রথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেই প্রথা গতকালই মান্য করেছি। এখন কীসের জন্য যেতে হবে? এরপর বাদশাহ সোবহান কুলিকে নির্দেশ দিয়ে মির্জা হিন্দালের কাছে পাঠালেন। যাতে মির্জা হিন্দাল তাঁর প্রভাব খাটিয়ে হামিদা বানুকে বাদশাহের সমীপে হাজির করে। মির্জা হিন্দাল বললেন, আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে সম্মত নয়। তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে দেখ। সোবহান কুলি হামিদা বানুর কাছে গিয়ে বাদশাহের মনোবাসনার কথা জানালেন। শুনে হামিদা বানু বললেন, বাদশাহকে রেওয়াজ অনুযায়ী একবার দেখা যায়। দ্বিতীয় বার দেখাটা নাজায়জ (অবৈধ), কারণ তখন তিনি আমার কাছে একজন পরপুরুষ মাত্র। অতএব আমি আর তাঁর সামনে যেতে পারি না। সোবহান কুলি সমস্ত ঘটনা বাদশাকে নিবেদন করলেন। শুনে বাদশাহ স্মিত হেসে বললেন, এখন আমি পরপুরুষ কিন্তু আপন হতেও তো পারি।

চল্লিশ দিন ধরে বাদশাহ এবং হামিদা বানুর মধ্যে এধরনের মান অভিমানের পালা চলল। হামিদা বানু বাদশাহকে শাদি করতে মোটেই রাজি নয়। আমার জননী দিলদার বেগম তাঁকে অনেক বোঝালেন। বললেন, একদিন না একদিন তোমাকে শাদি করতেই হবে এবং একজন পুরুষের সঙ্গেই তোমার শাদি হবে। তাহলে বাদশাহের সঙ্গে শাদির প্রস্তাবে তুমি অরাজি কেন? বাদশাহের চেয়ে সুপাত্র তুমি কোথায় পাবে?

উত্তরে হামিদা বানু বললেন, 'আপনি যথার্থই বলেছেন, আমাকে যে কোনো একজন পুরুষকেই শাদি করতে হবে। কিন্তু সে হবে এমন পুরুষ যাকে আমি সহজেই আমার কাছে পাব। আমি যাকে সর্বক্ষণ কাছে পাব না, যাঁর দর্শন লাভের জন্য আমাকে রীতিমতো ধৈর্য ধরে সাধনা করতে হবে, তেমন মানুষকে আমি কোন্ দুঃখে শাদি করতে যাব।'

এভাবে চল্লিশদিন ধরে নানা যুক্তি, তর্ক, মান অভিমানের পর ৯৪৮ হিজরি জমদিয়াল আউয়াল মাসের মঙ্গলবারে নিকাহের দিনক্ষণ স্থির হল। মির আবুল বকা কাজির ভূমিকা পালন করেন। বাদশাহের সঙ্গে হামিদা বানুর নিকাহ্ সম্পন্ন করার জন্য মির আবুল বকাকে দক্ষিণাস্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দেয়া হয়। নিকাহের পর বাদশাহ তিনদিন এখানে বাস করেন, তারপর জলপথে ভক্কর চলে যান। ভক্করে বাদশাহ একমাস থাকেন। মির আবুল বকাকে ভক্করের শাসনকর্তার কাছে দূতরূপে পাঠানো হয়। মির আবুল বকা ভক্করে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

এরপর বাদশাহ মির্জা হিন্দালকে কান্দাহার যাবার অনুমতি দেন এবং মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে লেহরিতে রেখে স্বয়ং সাইহোয়ান যাত্রা করেন। সাইহোয়ানের অবস্থিতি ছিল খাট্টা এলাকা থেকে তিন-চার ক্রোশ দূরে। এখানে একটা মজবুত কেল্লা ছিল। মির আলিকা নামে একজন বাদশাহের কর্মচারী এই কেল্লার ভারপ্রাপ্ত ছিল। কেল্লার মধ্যে কয়েকটি তোপও ছিল। সাধারণভাবে এই কেল্লা দখল করার চেষ্টা ছিল খুবই দুঃসাধ্য। বাদশাহের সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আলিকাকে নির্দেশ দেয়া হল যে

AMARBOI.COM

যেন কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ না করে। আলিকা বাদশাহের নির্দেশ অগ্রাহ্য করায় শাহি ফৌজ সুড়ঙ্গ কেটে দুর্গের কাছে পৌঁছোয় এবং একটি সেতু নষ্ট করে দেয়। কিন্তু দুর্গটি এতই দুর্ভেদ্য ছিল যে এত করেও তাকে সম্পূর্ণ কবজা করা গেল না।

এসময় বাদশাহি লোক-লস্করের মধ্যে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বলতে গেলে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। অনেক সৈন্য দলত্যাগ করে পালিয়ে যায়। মির্জা শাহ হোসেনের সৈন্যরা চারদিকে ঘুরে ফিরে সুযোগ মতো শাহি ফৌজের লস্করদের গ্রেফতার করতে থাকে। এরপর মির্জা আদেশ দেয় যে বন্দি শাহি লস্করদের নদীতে ডুবিয়ে মারা হোক। বাদশাহ এখানে ছয়মাস কাল অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে মির্জা হোসেনের সৈন্যরা চারশো শাহি ফৌজের লস্করকে ছোটো একটা কামরায় বন্ধ করে রাখে এবং পরে তাদের নদীতে ডুবিয়ে মারে। এইভাবে প্রতিদিন তিন-চারশো করে করে প্রায় দশ হাজার শাহি সৈন্যকে জলে ডুবিয়ে মারা হয়। এইভাবে বাদশাহের সঙ্গে যখন আর সামান্য কিছু লোক-লস্কর ছিল তখন মির্জা হোসেন শাহ বড়ো বড়ো নৌকাতে তোপ, বন্দুক সাজিয়ে একেবারে প্রায় বাদশাহের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল। সাইহোয়ান শহরটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। শাহ হোসেন এসেই বাদশাহের মালপত্র ভর্তি নৌকাগুলিকে জলে ডুবিয়ে দেয়। তারপর একজন কাসেদ মারফত খবর পাঠায়, আমি আপনার নিমক খেয়েছি। তাই নিমকহারামি করব না কিন্তু আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়তে হবে। বাধ্য হয়ে বাদশাহ আবার ভক্কর ফিরে চললেন। ভক্কর পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই মির্জা হোসেন মির্জা ইয়াদগারকে বলল, ভক্কর তোমার, আর আমিও তোমার। তোমার সঙ্গে আমার কন্যার শাদি দিতেও ইচ্ছুক। মির্জা ইয়াদগার তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বাদশাহকে ভক্কর আসতে বাধা দেন এবং যুদ্ধের ভয় এবং ছলাকলার মাধ্যমে তাঁকে ফিরতে বাধ্য করেন।

বাদশাহ পিছিয়ে এসে ইয়াদগার নাসেরের কাছে এক কাসেদ প্রেরণ করে বললেন, 'বৎস তুমি আমার পুত্রের মতো। আমার পক্ষ হয়ে তুমিই শাহ হোসেনকে প্রতিরোধ করবে এই আশাতেই বসেছিলাম। ভেবেছিলাম দুঃসময়ে আর কাউকে না পেলেও তোমাকে সঙ্গে অবশ্যই পাব। কিন্তু তুমি আমার নফর ভৃত্যদের কুপরামর্শে আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার কেন করছ? তুমি নিশ্চিত জেনো এই নফরটি কোনো দিনই তোমার প্রকৃত মিত্র হবে না।' যদিও বাদশাহ ইয়াদগার নাসেরকে এহেন অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। অবশেষে বাদশাহ বললেন, এই শহরের শাসনভার আমি তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি রাজা মলদেবের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছি। তবে আমার একটা কথা অবশ্যই স্মরণে রেখো যে শাহ হোসেন তোমাকে এখানে বেশিদিন থাকতে দেবে না। বাদশাহ ইয়াদগার নাসেরকে এই বার্তা পাঠিয়ে রাজা মলদেবের এলাকার দিকে যাত্রা করেন। জয়সলমিরের পথ ধরে কয়েকদিন চলার পর রাজা মলদেবের রাজ্যের উপকণ্ঠে দিলদার কেল্লার কাছে তাঁরা পৌঁছান। ছদিন সেখানে থাকেন। এখানে বাদশাহের লোকজনের জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেল না। এমনকি ঘোড়াদের জন্য ঘাস পর্যন্ত মেলেনি, বাধ্য হয়ে বাদশাহ জয়সলমিরের দিকে সরে আসেন। জয়সলমিরে রাও বাদশাহকে সাময়িকভাবে



প্রতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে বাদশাহের কয়েকজন সঙ্গী নিহত হন। তাদের মধ্যে ছিলেন, সাহাম খান, জলদিয়ারের ভ্রাতা লোমা বেগ, পির মোহাম্মদ আখতা, রওশানক তুশকি ইত্যাদি নামগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে যুদ্ধে বাদশাহের জয় হয় এবং বিধর্মীরা পরাজিত হয়ে কেল্লায় আশ্রয় নেয়। বাদশাহ এই এক দিনে প্রায় তিরিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এক জলাশয়ের কাছে এসে থামেন। তারপর আবার জয়সলমির যাত্রা করেন। পথে বাদশাহকে স্থানীয় লোকের চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হতে হয়েছে বারবার। অবশেষে তিনি রাজা মলদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পাহলডি পরগনাতে গিয়ে উপস্থিত হন। রাজা মলদেব এসময় যোধপুরে ছিলেন। যিনি একটি জররাবক্তর এবং একপাত্র আশরফি বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠালেন। রাজা মলদেব বাদশাহকে স্বাগত জানিয়ে অনেক আশা ভরসার প্রতিশ্রুতি দেন এবং এও বলেন যে, বিকানির অঞ্চলকে তিনি আলা হজরতের হাতে সমর্পণ করবেন।

হজরত বাদশাহ নিশ্চিন্ত মনে ছাউনি ফেলেন এবং আতকা খানকে মলদেবের কাছে পাঠিয়ে তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এইসময় সুরখ কেতাবদার নামে এক ব্যক্তি যে যুদ্ধের প্রথম দিকে মোগলদের বিপর্যয়ের দিনে পালিয়ে গিয়ে মলদেবের কাছে আশ্রয় নিয়ে রাজার দরবারে কর্মচারী রূপে নিযুক্ত হয়েছিল। সে গোপনে বাদশাহকে এক আর্জি পাঠিয়ে বলে, আর অগ্রসর হবার কথা ভুলে যান বরং পশ্চাদাপসরণ করে এখান থেকে পালিয়ে যান। রাজা মলদেব আপনাকে বন্দি করবার সুযোগ খুঁজছে। তাঁর কোনো কথাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। শেরখান আপনার সন্ধানে রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছে। দূতের মাধ্যমে সে রাজাকে যে বার্তা পাঠিয়েছে তার সারমর্ম, যে কোনো উপায়ে বাদশাহ হুমায়ুনকে গ্রেফতার করো। যদি তুমি একাজে সফল হও তাহলে তোমাকে নাগুর, আলোর ও অন্যান্য জায়গা, যা তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। আতকা খান রাজা মলদেবের কাছ থেকে ফিরে এসে বাদশাহকে একই পরামর্শ দিয়ে বলল, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। জোহরের নামাজ শেষ করে বাদশাহ রওনা দিলেন। রওনা হবার পূর্ব মুহূর্তে দুজন গুপ্তচরকে আটক করা হয়। তাদের যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন তাদের একজন হাতের বাঁধন খুলে কাছে দাঁড়ানো মাহমুদ কর্দাবাদের তরবারিটি ছিনিয়ে নেয় এবং প্রথমেই মাহমুদকে হত্যা করে এবং অন্য কয়েক গোয়ালীয়রবাসী সৈনিককে আহত করল। দ্বিতীয় লোকটিও এই সুযোগে তার বাঁধন খুলে ফেলে একজনের কাছ থেকে একটি খঞ্জর কেড়ে নেয় এবং তার সাহায্যে সে কয়েকজনকে জখম তো করলই উপরন্তু বাদশাহের অশ্বটিকেও মেরে ফেলে। বহুকষ্টে সেই লোক দুটিকে আবার বন্দি করা হয়।

এমন সময় শোনা গেল যে মলদেব সসৈন্যে এদিকেই আসছে। বাদশাহের কাছে বেগম হামিদা বানুকে বহন করার জন্য কোনো অশ্ব ছিল না। বাদশাহ তরদি বেগের কাছে তার ঘোড়াটি চাইলেন কিন্তু বেগ ঘোড়াটি দিতে অস্বীকার করে। নিরুপায় বাদশাহ উটের পিঠে হাওদার ব্যবস্থা করতে বলেন। তিনি বললেন, আমি উটের পিঠে যাব আর আমার অন্য একটি ঘোড়ার পিঠে হামিদা বানু বেগম যাবেন।

AMARBOI.COM

নাদিম বেগ যখন শুনলেন যে বাদশাহ তাঁর সওয়ারি বেগম হামিদা বানুকে দিয়ে তিনি উটের পিঠে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তিনি তাঁর মাতাকে উটের পিটে উঠিয়ে সেই ঘোড়াটি বাদশাহের কাছে পেশ করেন।

এই ঘোড়ায় চরে বাদশাহ অমরকোটের দিকে যাত্রা করেন। একজন স্থানীয় লোককে সঙ্গে নিলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। চারদিকে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ চলছিল। কাফেলার ঘোড়া, উট প্রভৃতি জন্তুদের পা বালিতে বসে যাচ্ছিল। ওদিকে মলদেব তার বাহিনী নিয়ে বাদশাহের পিছনে তাড়া করে আসছিল। অনাহার আর অনিদ্রাকে সঙ্গী করে কাফেলা বিরামহীন ভাবে এগিয়ে চলছিল কোনো অজানার উদ্দেশ্যে। মলদেবের লোকেরা যখন বাদশাহি কাফেলার প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে তখন বাদশাহ তৈমুর সুলতান, মির্জা ইয়াদগার মোনেম খান এবং অন্য কয়েকজনকে বললেন, তোমরা তোমাদের চলার গতি শ্লথ করে দাও এবং শত্রুপক্ষের অগ্রগতি লক্ষ করো। ততক্ষণে আমরা নিরাপদে খানিকটা দূর এগিয়ে যেতে পারব। তারা বাদশাহের নির্দেশ মতো চলার গতি কমিয়ে পিছনে রয়ে গেল এবং সন্ধ্যা নেমে আসায় তারা পথ হারিয়ে ফেলল। বাদশাহ সারা রাত্রি পথ চলে, সকালে একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছালেন। তিনদিন যাবৎ ঘোড়াগুলি এক বিন্দু জলও পান করতে পারেনি। বাদশাহ সবে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমেছেন এমন সময় একজন লোক সেখানে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে যা বলল, তার মর্মার্থ, অসংখ্য উট আর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে হিন্দুরা এদিকেই আসছে। তাদের উদ্দেশ্য এই কাফেলাকে আক্রমণ করা। আলা হজরত তখন রওশন কোকা, নাদিম কোকা, শেখ আলি বেগ, মির ইয়াবন্দা মোহাম্মদবর, মির ওয়ালি এবং আরও কিছু সৈনাকে খোদার নাম স্মরণ করিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য পাঠান। বাদশাহর ধারণা হয়েছিল যে ইতিপূর্বে শত্রুদের মোকাবিলার জন্য পাঠানো তৈমুর-সুলতান, মোনেম খান ও মির্জা ইয়াদগার হয় নিহত না হয় বন্দি হয়েছে এবং তারপরই তারা আবার শাহি কাফেলার ওপরে হামলা করতে আসছে। বাদশাহ আবার অশ্বপৃষ্ঠে উঠলেন এবং কয়েকজন সঙ্গী সহ সামনের দিকে এগোলেন।

বাদশাহ তাঁর লোকদের খোদার নামে শপথ করিয়ে কাফেরদের প্রতিরোধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। শেখ আলি বেগ দূর থেকেই তির ছুঁড়ে রাজপুত সর্দারকে হত্যা করে। সর্দারের মৃত্যু হওয়ায় রাজপুতেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। বাদশাহের লোকেরা তাদের কয়েকজনকে বন্দিও করে। এরপর সকলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। হজরত বাদশাহ অবশ্য ইতিমধ্যেই অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়ে ছিলেন। বাদশাহের প্রেরিত সেনানীরা নিজেদের আবার সংগঠিত করেন এবং বাহাদুর নামের এক দূতকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে যাত্রা বিরতি ঘটাতে আর্জি জানায়। বলে, যে খোদার কৃপায় আমাদের জয় হয়েছে, কাফেররা প্রাণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

বাদশাহ এই সংবাদ পেয়ে তাঁর কাফেলাকে থামতে নির্দেশ দেন। যেখানে তাঁরা যাত্রা বিরতি করেন সেখানে জলের ব্যবস্থা ছিল। বাদশাহ তখনও দুশ্চিন্তায় ছিলেন এবং ভাবছিলেন যে তাঁর সেনা ও সেনাপতিদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। এমন সময় দূরে ধুলো



উড়িয়ে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। পুনরায় শাহি কাফেলাতে হট্টগোল বেধে গেল। 'আবার বুঝি মলদেবের সৈনারা আসছে।' আগন্তুকদের সঠিক পরিচয় জানার জন্য বাদশাহ একজনকে সেদিকে পাঠালেন। লোকটি ফিরে এসে জানাল যে, ওরা তৈমুর সুলতান, মির্জা ইয়াদগার ও মোনেম খান। এরা সুস্থ শরীরে ফিরে আসছে। গতরাত্রিতে এরা পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এদের অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে বাদশাহ প্রচণ্ড খুশি হলেন এবং খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ পথে কোথাও জল পাওয়া যায়নি। তিনদিন পর কয়েকটি জলের কূপ পাওয়া গেল। কূপগুলি ছিল খুবই গভীর এবং জলের রং ছিল লাল। কূপ থেকে পাত্র ভরে জল উপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সকলেই তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। একসময় কূপের দড়ি ছিঁড়ে চার পাঁচজন লোক সমেত কূপের মধ্যে পড়ে যায় এবং কূপের গভীরতার কারণে তাদের মৃত্যু হয়। তৃষ্ণার্ত লোকদের এরকম অবস্থা দেখে বাদশাহ তাঁর জন্য বরাদ্দ কূপটি থেকে প্রায় সমস্ত জলই তুলে এক জায়গায় জমা করেন এবং সকলে সেখান থেকেই জলপান করে। জোহরের নামাজের পর কাফেলা আবার রওনা হল। একদিন একরাত্রি পথ চলার পর একটি সরাইখানা পাওয়া গেল যার কাছে একটি পুকুর ছিল। উট এবং ঘোড়াগুলি সেখানে নেমে মনের সাধ মিটিয়ে জল পান করল। বাদশাহি কাফেলার লোকজনও প্রাণভরে জলপান করে নিল। কয়েকজন তো বেশি জল খেয়ে মারাও গেল। শাহি কাফেলাতে এসময় ঘোড়ার সংখ্যা তেমন ছিল না, তবে উট ও খচ্চর যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। এরপর অমরকোট পর্যন্ত যাত্রাপথে আর জলের কষ্ট হয়নি। অমরকোট খুবই সুন্দর জায়গা। এখানেও বেশ কয়েকটি জলাশয় ছিল। অমরকোটের রানা বাদশাহকে পরম সমাদরে স্বাগত জানালেন এবং কেল্লার মধ্যে বাস করতে অনুরোধ করলেন। শাহি ফৌজের লোকেরা অবশ্য কেল্লার বাইরেই রইল।

অমরকোটে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। এক টাকায় চারটি ছাগল মিলত। রানা বাদশাহের খিদমতে অনেক ছাগল পেশ করেন এবং এমন ভাবে আতিথেয়তা প্রদান করেন যা এক কথায় অবর্ণনীয়। এখানে বেশ কিছু কাল আনন্দে, চিন্তামুক্ত মনে কাটল। এদিকে রাজকোষ প্রায় খালি হয়ে এসেছিল। তরদি বেগের কাছে কিছু টাকা ছিল। বাদশাহ তার কাছে অর্থ সাহায্য চাওয়ায় সে বাদশাহকে কুড়িটাকা সুদে আশি হাজার আশরফি ধার দেয়। বাদশাহ এই অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং রানা ও তাঁর পুত্রকে খেলাত প্রদান করেন। বাদশাহ সৈন্যদের যে অর্থ দিয়েছিলেন তা দিয়ে অনেকে বেশ কয়েকটি ঘোড়া কেনে।

যেহেতু মির হোসেন রানার পিতার হত্যাকারী ছিল সেজন্য প্রতিশোধ নেবার মানসিকতায় রানা দুই-তিন হাজার দক্ষ সৈন্য নিয়ে এক অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং বাদশাহকে সঙ্গে নিয়ে ভক্কর রওনা হন। ভক্কর রওনা হবার আগে বাদশাহ তাঁর আত্মীয় পরিজনদের অমরকোটেই রেখে যান। এদের দেখাশোনার ভার ছিল খাজা মোয়াজেমের উপরে। বেগম হামিদা বানু এসময় সন্তানসম্ভবা

AMARBOI.COM

বাদশাহের ভক্কর রওনা হবার তিনদিন পর, ৯৪৯ হিজরি রজব মাসের চতুর্থ দিনে সকালবেলায় জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের জন্ম হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী তাঁর জন্ম সময় ছিল সিংহরাশি সম্ভবা। কারণ ওই সময়ে চাঁদ এক বিশেষ কক্ষ পরিক্রমা করছিল। এরকম সময়ে জন্মালে জাতক অসীম সৌভাগ্যবান ও দীর্ঘজীবী হয়।

বাদশাহ তিনদিনে খুব বেশি পথ অতিক্রম করেননি। এরই মধ্যে তরদি খান এই শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে এল। হজরত বাদশাহ সংবাদ শুনে যারপরনাই খুশি হলেন এবং এই সংবাদ বহন করে আনার জন্য তরদি মোহাম্মদ বেগের পূর্বেকার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেওয়া হল। লাহোরে বাদশাহ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে কথা স্মরণ করে নবজাতকের নাম রাখা হল জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। এরপর পুনরায় বাদশাহ ভক্করের দিকে যাত্রা করেন।

রানার লোকজন এবং জুল হেরাফ, সুদমা ও সেমিন্চা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকজন নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ হাজার। জৌন নামক এক পরগনাতে গিয়ে জানা গেল যে শাহ হোসাইনের এক গোলাম কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছিল, বাদশাহের আগমন সংবাদ পেয়ে তারা পালিয়েছে। জৌন থেকে থাট্টা ছয়দিনের পথ। বাদশাহ এই জৌনে প্রায় ছয়মাস কাল অতিবাহিত করেন। লোকজন পাঠিয়ে অমরকোটের কেল্লা থেকে হারেম সহ সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং আমির ওমরাহদের জৌনে আনিয়ে নেন। শাহজাদা আকবরের বয়স তখন মাত্র ছয়মাস।

অমরকোটের রানার সঙ্গে তরদি বেগের কোনো কারণে মনোমালিন্য ঘটে এবং সেটা চরমে গিয়ে পৌঁছায়। ফলে রানা একদিন বাদশাহকে ত্যাগ করে নিজের এলাকায় চলে যান। সুদমা এবং সেমিন্চার সৈন্যরাও রানাকে অনুসরণ করে। এদিকে অমরকোট থেকে শাহি পরিবারের সকলেই জৌনের দিকে রওনা হয়েছিল কিন্তু জুল হেরাফের রমণীদের পথিমধ্যেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়। বাদশাহ শেখ আলি বেগকে মুজাফ্ফর বেগ তুর্কমান-এর সঙ্গে জাজকা পরগনাতে পাঠান। এদিকে মির্জা হোসেন তাদের মোকাবিলার জন্য বিশাল সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুজাফ্ফর বেগ তুর্কমান পরাজিত হয় এবং শেখ আলি বেগ সহ অন্য আরও কয়েকজন শাহাদত (মৃত্যু) বরণ করেন।

এর কিছুকাল পর শাহাম খানের দুই ভাই খালেদ বেগ ও লুশ বেগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অধিকাংশ লোকই লুশ বেগকে সমর্থন করে। খালেদ বেগ এরফলে ক্রুদ্ধ হয়ে শাহি শিবির ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শাহ হোসাইনের সঙ্গে মিলিত হয়। বাদশাহ খালেদ বেগের জননী কোকা বেগমকে বন্দি করেন। গুলবুর্গ বেগম আবার এজন্য খুবই অখুশি হন। অবশেষে কোকা বেগমকে মুক্তি দিয়ে গুলবুর্গ বেগমের সঙ্গে মক্কা শরিফে তীর্থ যাত্রায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর বাদশাহের হেফাজত থেকে লুশ বেগও পালিয়ে যায়। বাদশাহ তাকে অভিশাপ দেন এই বলে, যে আমি তার পক্ষ নিয়ে খালেদ বেগের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে চরম নিমকহারামি করে। তার যেন খুব শীঘ্রই মৃত্যু হয়। খোদার কী মহিমা, বাস্তবে ঘটলও তাই। এই ঘটনার পনেরো দিনের মাথায় লুশ বেগ যখন নৌকায় শুয়েছিল, তখন তার এক ভৃত্য তাকে হত্যা করে।



শাহ হোসাইন তার নৌবহরকে নদীপথ ধরে আসা বাদশাহের শিবিরের কাছে সন্নিবেশ করল এবং স্থলপথেও অনেক সৈন্য সমাবেশ করে। উভয়পক্ষে সর্বদাই ছোটোখাটো সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটত এবং তার ফলে দুপক্ষেরই লোকজন হতাহত হত। শাহি তরফের নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা তাজুদ্দিন। ইনি একজন প্রকৃত গুণি ব্যক্তি ছিলেন। এদিকে শাহি লোকজনের মধ্যে তরদি বেগ আর মোনেম খানের মধ্যে বিবাদ বেধে যায়। অবশেষে মোনেম খানও পালিয়ে গেল। এখন বাদশাহের সঙ্গে রইল শুধু তরদি মোহাম্মদ বেগ, মির্জা ইয়াদগার, মির্জা ইয়াবেন্দা মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলি, নামিদ কোকা, রওশন কোকা, খোজাঙ্গে ইশ্‌ক্‌ আগাচি ও অন্য কিছু লোক।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, বৈরামখান গুজরাট থেকে রওনা হয়ে জাজকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। বাদশাহ এই সংবাদে খুবই খুশি হলেন এবং খোজাঙ্গে আগাচিকে আদেশ করলেন লোক-লস্কর সহ গিয়ে বৈরাম খানকে অভ্যর্থনা জানাতে। শাহ হোসাইনের কাছেও বৈরাম খানের আগমন বার্তা পৌঁছেছিল। তাঁকে আটকাবার জন্য শাহ সৈন্য পাঠায়। শিবিরে যখন বৈরাম খান ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন তখন শাহ হোসাইনের লোকেরা তাঁর উপরে হামলা করে। খোজাঙ্গে ইশ্‌ক্‌ আগাচি হামলাকারিদের বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। বৈরাম খান কিছু লোক লস্কর নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে বাদশাহের খিদমতে উপস্থিত হতে সমর্থ হন।

এসময় বাদশাহের হয়ে কেরাচা খান কান্দাহার থেকে মির্জা হিন্দালকে কয়েকখানা পত্র লেখেন। তাতে লেখা ছিল, আপনি বেশ কিছুকাল ধরে দূর অঞ্চলে রয়েছেন। এদিকে শাহ হোসাইন দিন দিন শত্রুতা বাড়িয়েই চলেছে। এত কিছু সত্ত্বেও খোদার রহমতে এখানকার অবস্থা এখন অনুকূল। এখন বাদশাহ স্বয়ং যদি আসেন তো উত্তম, নাহলে আপনি অন্তত চলে আসুন। বাদশাহ যাত্রা স্থগিত রেখে মির্জা হিন্দালকে পাঠিয়ে দিলেন। মির্জা হিন্দাল পৌঁছালে পর কেরাচা খান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং কান্দাহার তাঁর কাছে সোপর্দ করেন।

মির্জা আসকরি এসময় গজনিতে ছিলেন। মির্জা কামরান তাঁকে লিখলেন যে, কেরাচা খান মির্জা হিন্দালকে কান্দাহারের ভার দিয়ে দিয়েছেন, অতএব কান্দাহার নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তা করা উচিত। মির্জা কামরানের বাসনা ছিল যে মির্জা হিন্দালের কাছ থেকে কান্দাহার তিনি কেড়ে নেবেন।

বাদশাহ হুমায়ুন মির্জা কামরানের এধরনের পরিকল্পনায় খুবই ব্যথিত হন এবং বিষয়টির মীমাংসার জন্য তাঁর পিতৃস্বসা খানজাদা বেগমের কাছে এলেন এবং তাঁকে অনুনয় করে বললেন, আমার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে আপনি কান্দাহার যান এবং মির্জা কামরান ও মির্জা হিন্দালকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সংযত রাখুন। উজবেক এবং তুর্কিরা তাদের খুব কাছাকাছিই আছে। বিপদ যখন শিয়রে, তখন আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ থাকা উচিত নয়। মির্জা কামরানকে আমি যা বলেছি, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন করে তাহলে সে যা চাইবে, আমি তাকে তাই দেবার চেষ্টা করব।

হজরত খানজাদা বেগম কান্দাহারে পৌঁছানোর পর মির্জা কামরানও সেখানে পৌঁছান।


AMARBOI.COM

মির্জা কামরান কান্দাহারের খোৎবা যাতে তার নামে পড়া হয় সেজন্য রোজই পীড়াপীড়ি করতেন। খানজাদা বেগম তাকে বলেন, মহান বাদশাহ বাবুর তাঁর জীবনকালেই হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে রাজ্যশাসন করবার দায়িত্বভার তার ওপরে দিয়ে গিয়েছেন। এবং আমরা পরিবারের সকলেই এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছি। সেই সময় থেকেই এই অঞ্চলে বাদশাহ হুমায়ুনের নামে খোৎবা পাঠ করা হয়। এখন তার পরিবর্তন ঘটানো সমীচীন নয়।

এরপর মির্জা কামরান হজরত দিলদার বেগমকে লিখলেন যে কাবুল থেকে আমি আপনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে আসছি, কিন্তু আপনি একদিনও এই অধমকে দেখতে এলেন না। আপনি যেমন মির্জা হিন্দালের জননী, তেমনই আমারও জননী। আপনি আপনার এই সন্তানের কাছে চলে আসুন। দিলদার বেগম মির্জা কামরানের কাছে চলে গেলেন। সেখানে যাবার পর মির্জা কামরান তাঁকে বললেন, যতক্ষণ না আপনি মির্জা হিন্দালকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছেন, ততক্ষণ আপনাকে আমি ফিরে যেতে দেব না। দিলদার বেগম তাকে বললেন, খানজাদা বেগম একজন বর্ষীয়সী রমণী এবং আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন, খোৎবা পাঠের বিষয়ে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করো। মির্জা কামরান বেগম খানজাদার কাছে ওই একই আর্জি নিয়ে যান এবং বেগম তাকে বলেন, খোৎবা পাঠের বিষয়টির মীমাংসা স্বয়ং মরহুম বাদশাহ বাবুরই করে গেছেন, হুমায়ুনকে বাদশাহি অর্পণ করে। তোমাদের কর্তব্য তার নামেই খোৎবা পাঠ চলতে দেয়া এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো।

এতকিছু সত্বেও মির্জা কামরান চারমাস ধরে কান্দাহার অবরোধ করে তার নামে খোৎবা পাঠের জন্য জোর করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই মীমাংসা হল যে বাদশাহ যতদিন দূরে আছেন ততদিন মির্জার নামেই খোৎবা পাঠ হবে। চারমাস ধরে অবরোধের ফলে কান্দাহারের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে মির্জা কামরানের নামে খোৎবা পাঠ করাকে সকলে বিরক্তির সঙ্গে স্বীকার করে নেয়। এরপর কান্দাহার মির্জা আসকরিকে দিয়ে মির্জা হিন্দালকে গজনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর মির্জা কামরান গজনিতে এসে মুলফাজাত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মির্জা হিন্দালকে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই শপথ ভঙ্গ করে তা কেড়ে নেন। মির্জা হিন্দাল বিক্ষুব্ধ হয়ে বদখসানের দিকে চলে যান। সেখানে খোস্ত ও ইন্দেরাব অঞ্চলে বাস করতে থাকেন।

মির্জা কামরান দিলদার বেগমকে বললেন, আপনি গিয়ে মির্জা হিন্দালকে ফিরিয়ে আনুন। দিলদার বেগম মির্জা হিন্দালের কাছে গেলেন, কিন্তু মির্জা হিন্দাল বললেন, 'আমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ বিগ্রহ সবই পরিত্যাগ করেছি এবং এখানে শান্তিতে দিন যাপন করছি।' মাতা দিলদার বেগম বললেন, 'সত্যি, তোমার মধ্যে যদি বৈরাগ্যের ভাব এসে থাকে তাহলে তা পালনের পক্ষে কাবুলও মন্দ জায়গা নয়, তুমি সেখানে গিয়ে আমাদের কাছাকাছি থাক। মাতা দিলদার বেগম একরকম জোর করেই মির্জা হিন্দালকে কাবুলে ফিরিয়ে আনেন।

এদিকে ভক্করে মির্জা হোসেন বাদশাহ হুমায়ুনকে বার্তা পাঠিয়ে বললেন, আপনার পক্ষে এই এলাকা ছেড়ে কান্দাহার চলে যাওয়াই যথার্থ হবে। বাদশাহ এতে সম্মত হয়ে তাঁকে জানালেন যে, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত কিন্তু আমার কাছে প্রয়োজনীয় বাহন অর্থাৎ পর্যাপ্ত ঘোড়া এবং উট নেই। আপনি যদি এবিষয়ে সাহায্য করেন তাহলে আমি অবিলম্বে কান্দাহার যাত্রা করতে পারি।

শাহ হোসেন বাদশাহের প্রস্তাবের উত্তরে জানালেন, আপনি নদী অতিক্রম করুন, দেখবেন নদীর ওপারে একসহস্র উট আপনার প্রতীক্ষা করছে। ওই উটগুলো আপনাকে আমি দিলাম।

( ভক্কর অঞ্চলের সমস্ত ঘটনাবলি খাজা গাজির মুখে শোনা এবং খাজা কিচকের রোজনামচা থেকে সংগৃহীত )

এরপর বাদশাহ পরিবার-পরিজন, লোক-লস্কর নিয়ে তিন দিন ধরে নদী পার হন এবং মির্জা শাহ হোসেনের এলাকা ছেড়ে নওয়াস নামে এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে পৌঁছে বাদশাহ সুলতান কুলি নামে এক উটের মাহুতকে মির্জা হোসেনের দেয়া এক সহস্র উটকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। সুলতান কুলি এক সহস্র উট এনে বাদশাহের খিদমতে পেশ করে। বাদশাহ অধিকাংশে উটই আমির ওমরাহ ও সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তবে উটগুলো ছিল প্রায় বন্য, মানুষ বা লোকালয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় বোধহয় খুব বেশি দিনের নয়। কাফেলাতে ঘোড়ার সংখ্যা কম থাকায় উটগুলোতেই সওয়ারি ও মালপত্র দুটোই চাপানো হয়েছিল। কিন্তু উটগুলো সওয়ারি বহন করতে অস্বীকার করে গা ঝাড়া দিতে থাকে, যাতে সওয়ারিরা অধিকাংশই ভূপাতিত হয়, এবং উটগুলো সওয়ারি ফেলে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। আর যে উটগুলোর পিঠে মালপত্র চাপানো হয়েছিল সেগুলোও কাফেলার ঘোড়াদের হ্রেষারব শুনে চমকে ওঠে এবং মালপত্র ফেলে পূর্বসুরীদের অনুসরণ করে। বেশ কিছু উট মালপত্র নিয়েই পালায়। এ ভাবে প্রায় দুশো উট পালিয়ে যায়।

কান্দাহারের পথে বাদশাহ হুমায়ুন সেবির উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে সংবাদ পান যে, মাহমুদ সারবান, মির্জা শাহ হোসেনের এক কর্মচারী সেবিতে আছে। বাদশাহের আগমনবার্তা পেতেই মাহমুদ সারবান কেল্লা সুদৃঢ় করে বন্ধ করে দেয়। সেবি তখনও প্রায় দুই ক্রোশ দূর এমন সময় খবর এল যে, মির আল্লা দোস্ত এবং বাবা জুবক, কাবুল থেকে কয়েকদিন আগে এখানে এসেছিল এবং তারা সঙ্গে এনেছিল মির্জা শাহ হোসেনকে প্রদত্ত শিরোপা এবং বহু উপঢৌকন। মির্জা কামরান ওগুলো শাহ হোসেনকে পাঠিয়েছিলেন। মির্জা কামরান শাহ হোসেনকে আরও অনুরোধ জানিয়েছেন যে, শাহ হোসেন যেন তাঁর কন্যাকে তাঁর (মির্জা কামরান) সঙ্গে বিবাহ দেন।

বাদশাহ খাজা গাজিকে বললেন, 'আল্লা দোস্ত এবং তোমার মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। তুমি চিঠি লিখে তার কাছে জানতে চাও যে, আমি কাবুল পৌঁছালে কামরান মির্জা আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে পারে?' বাদশাহ তাকে আরও বললেন যে, সে যেন আল্লা দোস্তকে বলে যে ফেরার পথে সে যদি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে তাহলে খুবই

AMARBOI.COM

ভালো হয়। খাজা সেবির দিকে যাত্রা করল। বাদশাহ বললেন, তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

সেবিতে পৌঁছে খাজা মাহমুদ সারবানের হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। সারবান খাজা গাজিকে জিজ্ঞাসা করল যে সে কী উদ্দেশ্যে সেবিতে এসেছে। খাজা উত্তরে বলল, উট ও ঘোড়া কেনাই তার এখানে আসার কারণ। মাহমুদ তার কথা বিশ্বাস করেনি, সে লোকজনকে বলল খাজার দেহ তল্লাশি করতে। নিশ্চই সে আল্লা দোস্ত অথবা বাবা জুবকের উদ্দেশে কোনো বার্তা এনেছে। খানাতল্লাশিতে খাজার শরীর থেকে চিঠি বের হল, যেটাকে খাজা অনেক কৌশলেও নষ্ট করতে পারেনি। মাহমুদ সারবান চিঠিটা পড়ল। তারপর আল্লা দোস্ত ও বাবা জুবককে কেল্লার বাইরে এনে তাদের চিঠির কথা বলে নানাভাবে শাসানো হল। আল্লা দোস্ত ও বাবা জুবক খোদার নামে কসম খেয়ে বলল, তারা এই পত্রের বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। যেহেতু খাজা গাজি আমার আত্মীয় আমার কাছেই সে লেখাপড়া শিখেছে এবং আমরা একই সঙ্গে কামরান মির্জার কাছে ছিলাম, সেই কারণেই সে আমাকে পত্র লিখেছে। সব শুনে মাহমুদ সিদ্ধান্ত নিল যে, সে খাজা গাজি কিচকের সঙ্গে আল্লা দোস্ত ও বাবা জুবককেও শাহ হোসেনের কাছে পাঠাবে। মির আল্লা দোস্ত ও বাবা জুবক সারারাত মাহমুদ সারবানের নজরবন্দি রইল এবং অনেক খোসামোদ করে তার রাগ কমাতে সক্ষম হল। মির আল্লা দোস্ত বাদশাহকে নজরানা রূপে তিনশত আনার (ডালিম) এবং একশত বহি (একরকম ফল) পাঠাল এবং মৌখিকভাবে বার্তা পাঠাল যে মির্জা আসকরি কিংবা কোনো আমির ওমরাহের চিঠি এলে তবেই কাবুল যাওয়া যেতে পারে। লিখিত বার্তা পাছে কারও হাতে ধরা পড়ে সেই আশংকাতেই মৌখিক বার্তা পাঠানো হয়। খাজা গাজি কিচক এসে সমস্ত ঘটনা বাদশাহকে নিবেদন করল এবং এও জানাল যে বাদশাহের সঙ্গে তখন যে সংখ্যায় লোকজন রয়েছে তাতে হঠাৎ করে কাবুলে যাওয়া সমীচীন হবে না। শুনে বাদশাহ খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না যে কোথায় যাওয়া যেতে পারে। তিনি আমির ওমরাহদের কাছে মতামত চাইলেন। তরদি মোহাম্মদ খান ও বৈরাম খান বললেন শালমস্তান ও উত্তরাঞ্চল (কান্দাহারের সীমান্ত) ব্যতীত অন্য কোথাও যাওয়া সমীচীন হবে না।

অবশেষে সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল এবং ফাতেহা পাঠ করে কান্দাহারের দিকে বাদশাহ যাত্রা করলেন। যখন শালমস্তানের কাছাকাছি রলি পরগনাতে পৌঁছান তখন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল। বাদশাহ স্থির করলেন, যে করেই হোক শালমস্তান পৌঁছাতেই হবে। জোহরের নামাজের সময় এক উজবেক তার খচ্চরকে প্রায় ছোটাতে ছোটাতে সেখানে এসে হাজির হয়ে বাদশাহকে বলল, 'হজরত! আপনি আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করবেন না। কেন করবেন না, সে কথা বলার মতো সময়ও নেই।' বাদশাহ একথা শুনেই অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে রওনা দিলেন। দুই তির পর্যন্ত পথ পার হয়ে বাদশাহ খাজা মোয়াজ্জেম ও বৈরাম খানকে পাঠালেন বেগম হামিদা বানুকে আনার জন্য। তাঁরা এসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেগমকে সওয়ারিতে ওঠালেন, কিন্তু শিশুপুত্র জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরকে সঙ্গে নেওয়ার সুযোগটুকুও তাদের হল না। বেগম সবেমাত্র শিবিরের বাইরে এসেছেন, ইতিমধ্যে মির্জা আসকরি দুই হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত। চতুর্দিকে তখন দারুণ হট্টগোল। মির্জা আসকরি জিজ্ঞেস করলেন, বাদশাহ কোথায়? লস্করেরা বলল, তিনি অনেকক্ষণ হল শিকারে গিয়েছেন। মির্জা আসকরি বুঝতে পারলেন যে, যে ভাবেই হোক তাঁর আগমণ সংবাদ বাদশাহ আগেই পেয়েছেন এবং স্থানত্যাগ করেছেন। মির্জা আসকরি তখন শাহজাদা আকবরকে বন্দি করে নিয়ে গিয়ে সুলতানম বেগমের কাছে সমর্পণ করেন এবং সৈন্যদের কান্দাহার গমনে আদেশ দেন। সুলতানম বেগম শিশু শাহজাদাকে যথেষ্ট স্নেহ যত্নে নিজের কাছে রাখেন। বাদশাহ পাহাড়ি পথে চার ক্রোশ মাত্র পথ এসেছিলেন। ইতিমধ্যে শিবিরের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে আরও দ্রুত চলতে থাকেন। এই সময়ে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন বৈরাম খান, খাজা মোয়াজ্জেম, খাজা নিয়াজি, নাদিম কোকা, রওশান কোকা, হাজি মোহাম্মদ খান, বাবা দোস্ত বখসি, মির্জা কুলি বেগ চুলি, হায়দার মোহাম্মদ আফতা বেগি, শেখ ইউসুফ চুলি, ইব্রাহিম ইশ্‌ক আগা, হাসান আলি ইশ্‌ক আগা, ইয়াকুব কুরচি, আম্বর নাজের, মালিক মুখতার, সম্বল মির হাজার, খাজা কিচক, খাজা গাজি ইত্যাদি।

এসম্বন্ধে হামিদা বানু বলেছেন যে, ওই সময় তাঁর সঙ্গে তিরিশ জনের একটি বাহিনী ছিল এবং হাসান আলির স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সকলেই 'এশা' নামাজের প্রাক্কালে উদ্দিস্ট পাহাড়টির সানুদেশে এসে উপস্থিত হন। পাহাড়ে তখন তুসারপাত হচ্ছিল এবং তুষার পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নীচেও আসছিল। পাহাড়ে ওঠা যায় এমন কোনো পথও ছিল না। অথচ প্রতি মুহূর্তেই বিশ্বাসঘাতক মির্জা আসকরির সেখানে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনাই ছিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর খুবই সংকীর্ণ একটা পথের খোঁজ মিলল যেটা অনুসরণ করলে পাহাড়ের উপরে যাওয়া যেতে পারে। উপরে উঠেও সমস্ত রাত্রি সেই তুসারপাতের মধ্যেই কাটাতে হল। আগুন জ্বালাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কোনো খাদ্যবস্তুও সঙ্গে ছিল না। প্রবল শীতে এবং ক্ষুধায় অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। বাদশাহ বললেন, কোনো খাদ্যই যখন নেই, তখন একটা ঘোড়া জবাই করা যাক। কিন্তু সঙ্গে রান্না করা যায় এমন একটি বাসনও ছিল না। অনেক কষ্টে আগুন জ্বালানো হল, তারপর মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাকেই রন্ধন পাত্র তৈরি করে মাংস রান্না হল। বাদশাহ স্বহস্তে মাংসের কাবাব তৈরি করে সকলকে খাওয়ালেন। খেতে খেতে তিনি বললেন, শীতে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

অনেক প্রতীক্ষার পর সেই কষ্টের রাত্রির অবসান হল। সকালবেলা দেখা গেল দূরের একটি পাহাড়ের কাছে জনবসতি আছে। বাদশাহ বললেন, 'চল ওদিকে যাওয়া যাক। ওই পাহাড়ি জনবসতিতে পৌঁছাতেও শাহি কাফেলার দুই দিন লেগেছিল। পাহাড়ে কয়েকঘর বেলুচি উপজাতির বাস ছিল। যাদের ভাষা ছিল অদ্ভুত ধরনের। বাদশাহ পাহাড় ঘেরা এক জায়গায় তাঁর শিবির স্থাপন করলেন। এইসময় তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র তিরিশ জন লোক। বেলুচি উপজাতির লোকেরা অদম্য কৌতূহল নিয়ে শিবির ঘিরে দাঁড়াল। বাদশাহ শিবিরের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বেলুচিরা দূর থেকে তাঁকে দেখতে পায় এবং তাদের মনে

AMARBOI.COM

কুঅভিসন্ধি জেগে ওঠে। তারা ভাবল, এই অবস্থায় বাদশাহকে বন্দি করে মির্জা আসকরির কাছে নিয়ে গেলে অনেক পুরস্কার মিলবে। হাসান আলির স্ত্রী ছিলেন বেলুচি বংশের কন্যা। তিনি ওদের ভাষা খানিকটা বুঝলেন এবং সকলকে বললেন যে ওদের অভিসন্ধি ভালো নয়। পরদিন সকালে বাদশাহ জায়গা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেলুচিরা বলল, তাদের দলপতি এখন এখানে নেই, তার না আসা পর্যন্ত বাদশাহ এখান থেকে যেতে পারবেন না। তাছাড়া এখন কোনো যাত্রারম্ভের পক্ষে সময়ও অশুভ। বাধ্য হয়ে বাদশাহ সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। মধ্য রাত্রিতে বেলুচি দলপতি ফিরে এসে বাদশাহের খিদমতে হাজির হল এবং বলল যে, মির্জা কামরান এবং মির্জা আসকরি আমাকে ফরমান পাঠিয়েছেন যে, 'বাদশাহ হুমায়ুন মনে হয় তোমার অঞ্চলে অবস্থান করছেন। যদি তিনি ওখানে থেকে থাকেন, তাহলে তাঁকে ওই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যেতে দেবে না, বরং তাঁকে বন্দি করে আমাদের কাছে পাঠাও এবং তাঁর সমস্ত মালপত্র, ঘোড়া ইত্যাদি তোমরা নিয়ে নাও।' আমি যতক্ষণ আপনাকে দেখিনি ততক্ষণ আমার মনে মির্জা কামরান ও মির্জা আসকরির ফরমান পালন করার আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখন আমার মন পরিবর্তিত হয়েছে। আমার এবং আমার পরিজনদের প্রাণ এখন আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনাদের সকলের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব এখন আমার। আপনি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন। খোদা আপনাকে বহাল তবিয়তে রাখুন। এর ফলে হয়তো মির্জা আসকরি আমাদের উপরে প্রতিশোধ নিতে পারে। আমরা সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা খোদার রহমতে নিজেরাই করব। বাদশাহ খুশি হয়ে বেলুচি সর্দারকে নানা উপঢৌকন দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। পরদিন সকলে মিলে হাজিবাবা কেল্লার দিকে রওনা হলেন।

দুদিনের পথ পার হয়ে বাদশাহের কাফেলা ওই কেল্লায় পৌঁছায়। দুর্গটির অবস্থান ছিল গরমসের পরগনাতে একটি নদীর তীরে। এখানে একটি বাহিনী ছিল যার নায়ক ছিল সাদাত নামে এক সেনানি। তারা সকলেই বাদশাহকে স্বাগত জানায় এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। পরদিন মির্জা আসকরির দল থেকে আলাউদ্দিন মাহমুদ মির্জা বাদশাহের খিদমতে হাজির হন। তার সঙ্গে ছিল বেশ কিছু উট, ঘোড়া, শামিয়ানা ইত্যাদি। তিনি সমস্ত কিছুই বাদশাহের দরবারে পেশ করলেন, যার ফলে বাদশাহ খানিকটা চিন্তা মুক্ত হন। তারপরের দিন হাজি মোহাম্মদ খান কোকি তিরিশ-চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার ও একদল উট নিয়ে বাদশাহকে নিবেদন করেন।

বাদশাহ হুজুর নিজের ভ্রাতাদের এবং আমির ওমরাহদের ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্মে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য সকল কর্মই যাঁর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়, সেই মহান খোদার উপরে নির্ভর করেই খোরাসানের দিকে যাত্রা করেন। অনেক পাহাড়, উপত্যকা, পার হয়ে অবশেষে হজরত বাদশাহ খোরাসানের কাছে পৌঁছান।

বাদশাহ বাব-এ-হিলমন্দ পৌঁছেছেন এই সংবাদ পেয়ে ইরানের বাদশাহ তহমাস সাফাবি যারপরনাই বিস্মিত হন এবং নসিবের ফেরে ও বিশ্বাস হন্তাদের কূট চক্রান্তের জন্য বাদশাহ হুমায়ুনের মতো একজন মানুষকে সব কিছু ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে, একথা ভেবে যথেষ্ট দুঃখিত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সমস্ত লোকজন আমির ওমরাহ, আত্মীয় পরিজনদের বাদশাহ হুমায়ুনের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। বাদশাহ তহমাস-এর ভ্রাতা বাহরাম মির্জা, আলকাস মির্জা ও শাম মির্জা ওই বাহিনীর সম্মুখে ছিলেন এবং প্রথমেই তাঁরা বাদশাহের কুশল ইত্যাদি জানতে চান এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে তাঁকে নিয়ে আসেন। শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে শাহ তহমাসের ভ্রাতারা তাঁকে বাদশাহের আগমণ বার্তা জানান এবং বাদশাহ তহমাসও তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে বাদশাহ হুমায়ুনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। সকলেই মুগ্ধ হয়ে এই দুইজনের মিলন প্রত্যক্ষ করল। বাদশাহ হুমায়ুন যতদিন এখানে ছিলেন ততদিন প্রত্যহ বাদশাহ তহমাস তাঁর কাছে আসতেন। যেদিন কোনো কাজে তাঁর আসা সম্ভব হত না, সেদিন বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর সান্নিধ্যে যেতেন।

খোরাসানে থাকার সময় বাদশাহ সেখানকার প্রাসাদসমূহ, ফুল বাগিচা এবং অন্যান্য প্রমোদস্থলগুলো পরিদর্শন করেন। দুই বাদশাহ প্রায় আটবার শিকারে গিয়েছেন এবং প্রত্যেকবারই বেগম হামিদা বানু তাঁদের সহযাত্রিণী হয়েছেন। বেগম হাতির পিঠে চড়ে শিকারে যেতেন। বাদশাহ তহমাসের ভগিনী শাহজাদি সুলতানম ঘোড়ার পিঠে বসে তাঁদের অনুসরণ করতেন। (বাদশাহ নিজেই বলেছেন যে শিকারের সময় এক অশ্বারোহিণী তাঁদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন আর তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে রাখত একজন শ্বেত শ্মশ্রু বিশিষ্ট সৈনিক। বাদশাহ তহমাসের লোকজনই বলেছে যে, ওই অশ্বারোহিণী হলেন, শাহজাদি সুলতানম, বাদশাহ তহমাসের ভগিনী।)

খোরাসানে বাস করার সময় বাদশাহ তহমাস এবং তাঁর ভগিনী শাহজাদি সুলতানম বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। একদিন শাহজাদি সুলতানম বেগম হামিদা বানুর সৌজন্যে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। বাদশাহ তহমাস তাঁর ভগিনীকে বলেন যে, তুমি তোমার এই আতিথ্যের ব্যবস্থাপনা শহরের বাইরে কোথাও কর এবং সেই মতো শহরের বাইরে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে শিবির, তোরণ ইত্যাদি স্থাপন করে সেখানেই সেই ভোজ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

খোরাসান এবং ইরানের অন্যান্য জায়গাতে উৎসব অনুষ্ঠানের জায়গার সামনের দিকেই শুধু পর্দা দেওয়া হত, তারপর সবটাই থাকত উন্মুক্ত। বাদশাহ হুমায়ুন হিন্দুস্থানের রেওয়াজ অনুসারে চারদিকেই পর্দার ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠান স্থলের প্রবেশ পথে তোরণ তৈরি করা হত আর পর্দার গায়ে নানা ধরনের রং-বেরং-এর ঝালর টাঙিয়ে দেয়া হত। এই অনুষ্ঠানে বাদশাহ তহমাসের আত্মীয়েরা, তাঁর হারেমের রমণীরা ইত্যাদি মিলে প্রায় এক সহস্র স্ত্রীলোক সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে আলাপচারিতার কালে এক সময় শাহজাদি সুলতানম বেগম হামিদা বানুকে প্রশ্ন করেন যে, হিন্দুস্থানেও কি উৎসব অনুষ্ঠানে এরকম চিত্রকলা মণ্ডিত মণ্ডপ তৈরি হয়? উত্তরে বেগম হামিদা বানু বলেন যে, 'প্রবাদে হিন্দুস্থানকে চতুষ্পদ এবং খোরাসানকে দ্বিপদ বলা হয়ে থাকে, সেই প্রবাদ অনুযায়ী চতুষ্পদ সব সময় দ্বিপদের দ্বিগুণই হয়।' বাদশাহ তহমাসের কন্যাও বেগম হামিদা বানুকে সমর্থন করে বলেন, 'ফুফি সাহেবা, বেগম যথার্থই বলেছেন কোথায় দ্বিপদ আর কোথায় চতুষ্পদ।' সারাদিন সেই অনুষ্ঠান চলেছিল।

AMARBOI.COM

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আহার্য গ্রহণ করেন। আর বাদশাহ তহমাসের বেগমেরা শাহজাদি সুলতানমের উপস্থিতিতে এক বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান অন্তে শাহজাদি সুলতানম বেগম হামিদা বানুকে জর্দজি কারুকাজবিশিষ্ট বেশ কয়েকটি পোশাক উপঢৌকন দেন।

এশার নামাজের সময় সেদিন বাদশাহ তহমাস বাদশাহ হুমায়ুনের শিবিরে চলে আসেন। তিনি যখন শুনলেন বেগম হামিদা বানু উৎসব শেষে শিবিরে ফিরে এসেছেন, তখন বাদশাহ তাঁর নিজের মহলে ফিরে যান।

বাদশাহের এক বিশিষ্ট আমির রওশান কোকা, বাদশাহের প্রতি যার আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত এবং অতীতে বহু বিপদে সে বাদশাহ হুমায়ুনের পাশে দাঁড়িয়ে আপন কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছিল। এই বিদেশে এসে সে একটি অন্যায় কাজ করে ফেলে। বাদশাহর নিজস্ব এক কবচের মধ্যে পাঁচটি মহামূল্যবান লাল পাথর ছিল, যেগুলি সে অপহরণ করে। এই মূল্যবান রত্ন পাঁচটি সম্বন্ধে বাদশাহ এবং বেগম হামিদা বানু ছাড়া আর কেউ কিছু জানত না। কোনো কারণে বাদশাহকে কবচ খুলতে হলে তিনি সেটিকে বেগম হামিদা বানুর কাছেই ন্যস্ত করতেন। একদিন বেগম হামিদা বানু স্নান করার জন্য তাঁর গোসলখানায় যাবার আগে কবচটিকে একটি রেশমি বস্ত্রখণ্ডে মুড়ে বাদশাহের পালঙ্কের উপরে রেখে যান। ইত্যবসরে রওশন কোকা কবচ খুলে রত্ন পাঁচটিকে চুরি করে এবং খাজা গাজির কাছে সেগুলিকে গচ্ছিত রাখে। খাজা গাজিও রওশান কোকার এই অপকর্মের সঙ্গী ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপারটা মিটে গেলে তারা ওই রত্নগুলিকে বিক্রয় করবে এবং সেই অর্থ তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করবে। বেগম হামিদা বানু স্নান সেরে ফিরে এলে বাদশাহ তাঁকে কবচটি দেন। বেগম হাতে নিয়েই বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'এটিকে এত হাল্কা লাগছে কেন?' বাদশাহ বললেন, 'তা তো হবার কথা নয়। এত ভিতরের রত্নগুলির কথা তো তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।' হামিদা বেগম ঘটনাটি তাঁর ভ্রাতা খাজা মোয়াজ্জেমকে জানালেন এবং বললেন, 'বাদশাহের কাছে তোমার ভগিনীর সম্মান রক্ষার দায় এখন তোমার। তবে কোনো মতেই যেন বিষয়টি জানাজানি না হয়। তুমি খুব গোপনে খোঁজ খবর কর। যদি ওই রত্ন পাঁচটি উদ্ধার না হয় তাহলে তোমার এই ভগিনী সারা জীবন বাদশাহের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে।'

সব শুনে খাজা মোয়াজ্জেম বললেন, 'আমি একটা ব্যাপার আজ লক্ষ করেছি। তুমি আমার ভগিনী এবং বাদশাহও আমাকে যথেষ্ট সমাদর করেন, তা সত্ত্বেও একটা টাট্টু ঘোড়া কেনার ক্ষমতা আমার হয়নি, অথচ রওশান কোকা ও খাজা গাজি দুটো উন্নত জাতের তিবুচাক ঘোড়া কিনেছে। তবে যতদূর জানি ঘোড়ার দাম এখনও চোকানো হয়নি। তবে কোনো জায়গা থেকে মোটা রকম অর্থ পাবার আশা না থাকলে এরকম সওদা তারা করবে কেন?'

বেগম বললেন, 'ভাই সাহেব, আমার সম্মান এখন তোমার হাতে। তুমি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান কর।'

খাজা মোয়াজ্জেম বললেন, 'মাননীয়া ভগিনী তুমি নিশ্চিত থাক, আমার পক্ষ থেকে



চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না। তবে আমি যে কথাটা তোমাকে বললাম, তা যেন কোনো ভাবেই আর কেউ না জানতে পারে। খোদার অনুগ্রহে বাদশাহের হকের জিনিস তাঁর হাতে নিশ্চয়ই পৌঁছাবে।'

এরপর খাজা মোয়াজ্জেম সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়ে এবং ঘোড়া বিক্রেতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। খাজা মোয়াজ্জেম ঘোড়া বিক্রেতার কাছে জানতে চাইল যে সে কীসের ভরসায় খাজা গাজি ও রওশন কোকাকে ঘোড়া বিক্রি করেছে, যেখানে বাদশাহের দরবারের সকলেই প্রায় সর্বহারা অবস্থাতে এদেশে এসেছে। উত্তরে ঘোড়া বিক্রেতা বলল যে তারা মূল্যবান লাল রঙের জহরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোড়া নিয়ে গিয়েছে। খাজা মোয়াজ্জেম এরপর গেল খাজা গাজির বাসস্থানে। সেখানে গাজির অনুপস্থিতির সুযোগে তার ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল যে খাজা গাজি তার মূল্যবান জিনিসপত্র কোথায় রাখে। ভৃত্য বলল, খাজা গাজির কাছে এমন কোনো মূল্যবান জিনিসপত্র নেই, সেজন্যই সেসব সাবধানে রাখারও কোনো প্রশ্ন নেই। তবে তার একটি টুপি আছে। যেটিকে খাজাসাহেব সর্বক্ষণই পরে থাকে এবং সেটিকে খুলে রাখার সময়ও সে খুব সতর্ক থাকে। রাত্রিতে শয়নকালেও সেটাকে হাতের কাছে রাখে। খাজা মোয়াজ্জেম সব শুনে বুঝে নিল যে অপহৃত মূল্যবান পাথরগুলি এখন খাজা গাজির হেফাজতেই আছে এবং সেগুলি লুকানো রয়েছে তার টুপির মধ্যে। এরপর খাজা মোয়াজ্জেম সরাসরি বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে বলল —'আমি আপনার সেই হারানো রত্নের সন্ধান পেয়েছি এবং যে করেই হোক সেগুলিকে আমি উদ্ধারও করব তবে খাজা গাজি যদি আমার নামে কোনো নালিশ নিয়ে আপনার কাছে আসে, আপনি যেন তখন আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না।' বাদশাহ এসব কথা শুনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হলেন। তাঁর মুখের মৃদু হাসির মধ্যেও দুঃখ চাপা ছিল না। এদিকে খাজা মোয়াজ্জেম, খাজা গাজির সঙ্গে নানা ধরনের ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল। খাজা গাজি বেশ রাগতভাবে এসে বাদশাহকে অভিযোগ করল যে: আমি আপনার দরবারের একজন খানদানি ওমরাহ, চারদিকে আমার কিছু পরিচিতিও আছে। অথচ এই খাজা মোয়াজ্জেম, যে বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোটো, আমার ইয়ার দোস্তের মধ্যেও পড়ে না, সে আমাকে নিয়ে তামাসা করে। দূর বিদেশে এসে তার এহেন ব্যবহারের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

বাদশাহ হজরত বললেন, 'খাজা মোয়াজ্জেমের ওরকমই স্বভাব। সে সকলের সঙ্গেই তামাশা করে। এখনও তার বয়স অল্প তাই চাপল্যও কিছু বেশি। আপনি ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দেবেন না।' পরদিন যখন খাজা গাজি দিওয়ান খানায় বসেছিল তখন খাজা মোয়াজ্জেম এসে আবার তাকে নিয়ে তামাশা করতে আরম্ভ করল এবং এক ফাঁকে তার টুপিটা মাথা থেকে মাটিতে ফেলে দিল। এবং কায়দা করে টুপির মধ্যে লুকানো পাথরগুলিকে বার করে নিল। তারপর দ্রুত ওই জায়গা ত্যাগ করে বাদশাহের খিদমতে উপস্থিত হল। বেগম হামিদা বানুও তখন বাদশাহের কাছেই ছিলেন। খাজা মোয়াজ্জেম তাদের সামনে সেই রত্নগুলি পেশ করল। বাদশাহ রত্নগুলি ফিরে পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং খাজা মোয়াজ্জেমকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। খাজা গাজি ও রওশন [illegible]

AMARBOI.COM

অপ্রস্তুত হল এবং তারা বাদশাহ তহমাসের কাছে বাদশাহ হুমায়ুন এবং বেগম হামিদা বানু সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক মন্তব্য করল। তাদের কথা শুনে বাদশাহ তহমাস বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি খানিকটা বিরূপ হয়েছিলেন।

বাদশাহ তহমাস এবং বাদশাহ হুমায়ুন-এর মধ্যে বাইরের সম্পর্ক যদিও একইরকম ছিল কিন্তু তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাদশাহ হুমায়ুন সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। তিনি তাঁর কাছে যে সমস্ত মূল্যবান জহরত ছিল সেগুলি তিনি বাদশাহ তহমাসকে উপহার দেন। বাদশাহ তহমাস সেই উপহার পেয়ে যারপরনাই সন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, 'খাজা গাজি ও রওশন কোকা মোটেই ভালো লোক নয়। তারা দুজনে আমার কাছে আপনার সম্পর্কে নানা কথা বলে আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ককে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে আপনি আমার সহোদর ভাইয়ের মতো।'

এরপর দুই বাদশাহের মধ্যেকার সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং তা আগের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর হয়। বাদশাহ হুমায়ুন ও রওশন কোকা ও খাজা গাজিকে নিজের দরবার থেকে বহিষ্কার করে বিচারের জন্য শাহ তহমাসের হাতে তুলে দেন। শাহ তহমাস তাদের দুজনকে কারাবন্দি করেন।

ইরানে বাদশাহ হুমায়ুনের দিনগুলো এরপর ভালোভাবেই অতিবাহিত হতে থাকে। বাদশাহ তহমাস প্রতিটি বিষয়ে বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য ও সম্মান দেখাতেন এবং তাঁকে সর্বদাই কোনো না কোনো মূল্যবান বস্তু উপঢৌকন হিসাবে দিতেন। অবশেষে একদিন শাহ তহমাস তাঁর পুত্র খানান ও সালাতিন এবং অন্যান্য আমির ওমরাহ সহ এক বিরাট সৈন্যদল দিয়ে বাদশাহ হুমায়ুনকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। বিদায়কালে শাহ তহমাস বাদশাহকে অনেক শামিয়ানা, শাহি বেশভূষা, নানা কারুকাজ করা বস্ত্রসম্ভার, গদি, বাবুর্চি খানা, খাজিনা খানা, শাহি আসবাবপত্র উপহার দেন। এক শুভ মুহূর্তে দুই বাদশাহ পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহার যাত্রা করেন এবং যাত্রাকালে রওশান কোকা ও খাজা গাজির পূর্বেকার সুকৃতির কথা মনে রেখে তাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাদের নিজের দলে গ্রহণ করেন।

মির্জা আসকরি যখন সংবাদ পেলেন যে বাদশাহ খোরাসান থেকে ফিরে কান্দাহারের দিকে আসছেন, তখন তিনি শাহজাদা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরকে কাবুলে মির্জা কামরানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মির্জা কামরান শাহজাদাকে আকা জানম এবং মরহুম বাদশাহ বাবুরের ভগিনি খানজাদা বেগমের হাতে তুলে দেন। শাহজাদা আকবরের বয়স তখন মাত্র আড়াই বছর। খানজাদা বেগম শিশু শাহজাদার হস্তপদ চুম্বন করে বলতেন, এই শাহজাদার শারীরিক গঠন, গায়ের রং ইত্যাদি সবকিছুই আমার মরহুম ভ্রাতা বাদশাহ বাবুরের মতো।

বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহার পৌঁছালে মির্জা কামরান বর্ষীয়সী খানজাদা বেগমকে অনুরোধ করে বলেন যে, তিনি যেন নিজে কান্দাহার গিয়ে তাঁর ও বাদশাহ হুমায়ুনের মধ্যে একটা আপস মীমাংসা করে দেন। খানজাদা বেগম শিশু শাহজাদাকে মির্জা কামরানের স্ত্রী খানমের কাছে রেখে কান্দাহার যাত্রা করেন।

ওদিকে বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহার পৌঁছে একটানা চল্লিশ দিন ওই নগরকে অবরোধ করে রাখেন এবং বৈরাম খানকে দূত রূপে মির্জা কামরানের কাছে পাঠান। মির্জা আসকরি অবরুদ্ধ অবস্থায় বাদশাহের কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং কান্দাহারকে বাদশাহের হাতে তুলে দেন। বাদশাহ কান্দাহারের শাসনভার বাদশাহ তহমাসের পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই খোদার মর্জিতে ওই শাহজাদা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এরপর বৈরাম খান কাবুল থেকে ফিরে এলে কান্দাহারের ভার তাকে দেয়া হয় এবং বাদশাহ বেগম হামিদা বানুকে কান্দাহারে রেখে মির্জা কামরানের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে কাবুল রওনা হন।

আকা জানম এবং খানজাদা বেগমও বাদশাহি কাফেলার সহযাত্রিণী ছিলেন। কাবলহক নামের এক জায়গাতে পৌঁছানোর পর হঠাৎ খানজাদা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিন দিন ধরে তিনি জ্বর বিকারের মধ্যে ছিলেন। হাকিমদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাঁর রোগের কোনোই উপশম হল না। শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার চতুর্থ দিনে ৯৫১ হিজরিতে এই সম্মানীয়া রমণীর মৃত্যু হয়। কাবলহকেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনমাস পর আবার বাদশাহ তাঁর দেহাবশেষ কাবলহক থেকে তুলে এনে কাবুলে মরহুম বাদশাহ বাবুরের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করেন।

মির্জা কামরান এতকাল কোনো রাজ্যজয়ের চেষ্টা না করে কিছুটা নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ হুমায়ুনের আসার খবর পেয়ে আবার তাঁর মনে রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা প্রকট হয়ে ওঠে এবং তিনি হাজারা অঞ্চলে অভিযান করেন। অন্যদিকে মির্জা হিন্দালও নিষ্ক্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাচ্ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন বাদশাহ হুমায়ুন ইরান, খোরাসান, কান্দাহার ইত্যাদিকে তাঁর প্রভাবাধীন করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তাঁর মনে হল এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। তিনি তৎক্ষণাৎ মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে তলব করলেন এবং তাকে পরিস্থিতি বিশদ ব্যাখ্যা করে বললেন, বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহার জয় করেছেন এবং এই সংবাদ পেয়ে মির্জা কামরান খানজাদা বেগমকে পাঠিয়েছেন দূত হিসেবে যাতে বাদশাহ তার সঙ্গে সন্ধি করেন। বাদশাহ মির্জা কামরানের সন্ধির আবেদন অগ্রাহ্য করে বৈরামখানকে পাঠিয়েছেন। মির্জা কামরানও বৈরামখানের প্রস্তাব অস্বীকার করেছেন। এমতবস্থায় বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহারের ভার বৈরাম খানের হাতে ন্যস্ত করে কাবুলের দিকে রওনা হয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে আপনি মির্জা ইয়াদগার যে কোনো সুযোগে বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াস করুন। মির্জা ইয়াদগার মির্জা হিন্দালের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন মির্জা হিন্দাল তাঁকে বললেন, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাবুল থেকে পলায়ন করুন। আপনার পলায়ন সংবাদ পেয়ে মির্জা কামরান আমাকেই আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ভার দেবেন। আপনি কাবুল ত্যাগ করে ধীর গতিতে চলবেন। আমি আপনাকে ধরার অভিপ্রায়ে কাবুল থেকে বের হয়ে পথিমধ্যে আপনার সঙ্গে মিলিত হব, এবং উভয়ে দ্রুতগতিতে পথ চলে বাদশাহের খিদমতে হাজির হব।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মির্জা ইয়াদগার নাসের কাবুল থেকে পালিয়ে যায়। মির্জা কামরান কাবুলের বাইরে ছিলেন। তিনি মির্জা ইয়াদগারের পালাবার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি কাবুলে

AMARBOI.COM

ফিরলেন এবং মির্জা হিন্দালকে আদেশ করলেন, যে ভাবে পারো মির্জা ইয়াদগার নাসেরকে কাবুলে ফিরিয়ে আনো। মির্জা হিন্দাল তাঁর পরিকল্পনা সফল হচ্ছে দেখে উৎফুল্ল হলেন, এবং অশ্বারোহণে দ্রুত মির্জা ইয়াদগার নাসেরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুজনেই বাদশাহের খিদমতে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ তাদের পেয়ে যথেষ্ট খুশি হলেন এবং নির্দেশ দিলেন তারা যেন 'তাকিয়া হেমার'-এর পথ ধরে এগিয়ে যায়।

৯৫১ হিজরির রমজান মাসে বাদশাহ হুমায়ুন তাকিয়া হেমার পৌঁছান। বাদশাহের অগ্রগতির খবর পেয়ে মির্জা কামরান খুবই চিন্তায় পড়ে যান এবং যথাশীঘ্র নিজের অবস্থান ছেড়ে বাদশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য অগ্রসর হন। রমজান মাসের একাদশ দিনে জলগাতেপাতে নামের এক জায়গায় বাদশাহ মির্জা কামরানের মুখোমুখী হলেন। পরবর্তী পদক্ষেপই ছিল যুদ্ধ। উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীই পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিল। এরই মধ্যে একে একে মির্জা কামরানের প্রায় সমস্ত আমির ওমরাহ তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন। বাপুচ নামের এক বিশিষ্ট সেনানী, যিনি ছিলেন মির্জা কামরানের বিশেষ ভরসা, তিনিও সসৈন্যে মির্জা কামরানের শিবির পরিত্যাগ করে বাদশাহের খিদমতে নিজেকে পেশ করেন। একে একে প্রায় সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করায় মির্জা কামরান বস্তুত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। মির্জা কামরান তখন নিকটস্থ একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বাড়িটির মালিক ছিলেন বাপুচ। অবস্থা প্রতিকূল হওয়ায় মির্জা কামরান বাড়ির দরজা ভেঙে খিড়কি পথে পলায়ন করেন এবং নওরোজি হয়ে গুরখানা গুলবর্গ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর বারোজন সৈন্যকে বিদায় দেন এবং দিনান্তের অন্ধকার নামলে, মির্জা কামরান বাবা দস্তির পথে যাত্রা করেন। পথে ছোটো একটি জলধারা পড়ে। মির্জা কামরান সেখানে থেমে, দুস্তি কোকা ও জুকি কোকাকে ফেরত পাঠালেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হাবিবা, পুত্র মির্জা ইব্রাহিম সুলতান, হাজারা বেগম (খিজির খান হাজারার ভ্রাতুষ্পুত্রী), মাহি বেগম (খুররমের ভগিনী), হাজি বেগমের মাতা মাহ আফরোজ এবং বাকি কোকাকে নিয়ে আসার জন্য। পরে মির্জা কামরান তাঁর দলবলসহ থাট্টা এবং ভক্করের পথে রওনা হন।

ভক্করের পথে এক জায়গাতে খিজির খানের জায়গির ছিল। মির্জা কামরান সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। এখানেই আক সুলতানের সঙ্গে হাবিবা বেগমের নিকাহ্ হয় এবং নিকাহ্ শেষে কন্যা জামাতাকে বিদায় জানিয়ে পুনরায় থাট্টা ও ভক্করের দিকে যাত্রা করেন।

রমজান মাসের দ্বাদশ দিনে বাদশাহ হুমায়ুন মির্জা কামরানের উপরে বিজয় লাভ করেন। অতি প্রত্যূষে বাদশাহ সদলবলে প্রাসাদে পদার্পণ করেন। মির্জা কামরানের যে সমস্ত সৈন্য বাদশাহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল তারাও প্রচণ্ড ধুমধামের সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কাবুলে প্রবেশ করে। সেই দিনই পরম শ্রদ্ধেয়া মাতা দিলদার বেগম, ভগিনী গুলচেহারা বেগম এবং এই অধম (গুলবদন বেগম) বাদশাহের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাই।

প্রায় পাঁচ বছর আমি আমার ভ্রাতা এবং পরম শ্রদ্ধেয় বাদশাহ হুমায়ুনের সান্নিধ্য থেকে



বঞ্চিত হয়েছিলাম। এতকালের সেই বিচ্ছেদ এবং প্রতি মুহূর্তে স্বজন হারানোর আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে ও তাঁর স্নেহের ছায়ায় উপস্থিত হতে পারার সৌভাগ্যে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম। এক নিমেষে বাদশাহকে দেখেঃ আমার দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য যেন আবার ফিরে এসেছিল। বাদশাহকে এতকাল পরে আবার দর্শন করতে পেরে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে প্রণতি এবং ধন্যবাদ জানালাম।

প্রাসাদে তখন প্রতিদিনই জমজমাট আসর বসত। দেখতে দেখতে কোথা থেকে যে রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে যেত আমরা টেরই পেতাম না। যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতের অপরূপ মূর্ছনায় বিভোর হয়ে থাকতাম আমরা। এছাড়া নানা ধরনের খেলাধূলার মাধ্যমেও আমরা চিত্ত বিনোদন করতাম। তার মধ্যে একটি খেলা ছিল সকলেরই খুব প্রিয়। এই খেলায় যারা অংশ নিত, তাদের প্রত্যেকের কাছে থাকত বিশটি করে পাতা এবং পাঁচ মেসকাল ওজনের বিশটি শাহরুখি (রৌপ্যমুদ্রা)। খেলায় বিজিত পক্ষকে ওই বিশটি শাহরুখি বিজয়ী পক্ষকে দিতে হত।

চৌসা এবং কনৌজের যুদ্ধে যে সমস্ত রমণীরা স্বামী হারা হয়েছে, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা অনাথ হয়েছে অথবা যাদের প্রিয়জনেরা যুদ্ধে নিহত হয়েছে, বাদশাহ তাদের সকলের জন্য বিশেষ ভাতা, প্রয়োজনীয় খাদ্য, কৃষিজমি ইত্যাদি প্রদান করেন। বাদশাহের শাসনকালে তাঁর প্রজারা পরম সুখে, শান্তিতে এবং সমৃদ্ধিতে জীবন অতিবাহিত করত। সেইজন্য তারা মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদাই বাদশাহের দীর্ঘ নীরোগ জীবন এবং নিরবচ্ছিন্ন শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করত।

কিছুদিন পর বাদশাহ হুমায়ুন কান্দাহার থেকে বেগম হামিদা বানুকে কাবুলে নিয়ে আসেন। হামিদা বানু কাবুলে আসার পর শাহজাদা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের 'খৎনা' সম্পন্ন হয় এবং সেই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। নওরোজের পর সতেরো দিন ধরে উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সকলেই সবুজ রঙের পোশাক পরে। তিরিশ-চল্লিশজন সুন্দরী রমণীকে বলা হয়েছিল তারা যেন আপাদমস্তক সবুজ পোশাকে শরীর আবৃত করে পাহাড়ের উপরে আসে। নওরোজের দিন স্বয়ং বাদশাহ অন্যান্যদের নিয়ে ওই পাহাড়ের উপরে হাজির ছিলেন। এসময় শাহজাদা জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের বয়স ছিল পাঁচ বছর। কাবুলের শাহি দিওয়ানখানা কেল্লাতে এই খৎনা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে কাবুলের সমস্ত দোকানপাট, বাজার ইত্যাদিকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। মির্জা হিন্দাল, ইয়াদগার নাসের সহ অন্যান্য আমির ওমরাহরাও নিজ নিজ বাসভবন সুসজ্জিত করেন। অন্যদিকে বেগা বেগমের উদ্যোগে বসেছিল হারেমের রমণীদের আসর। ওখানেও সকলে নানা ধরনের উৎসব আমোদের আয়োজন করে।

সমস্ত সুলতান ও আমির ওমরাহদের দল দিওয়ানখানায় নানা ধরনের উপহার দ্রব্য নিয়ে আসে। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য সেখানে নানা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে খেলাত, পদক ও সুসজ্জিত পোশাক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

জনসাধারণ এবং আলেম দরবেশরাও মহা উৎসাহে এ

AMARBOI.COM

উৎসব শেষ হলে, বাদশাহ জাফর দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দুর্গ ছিল মির্জা সুলেমানের অধিকারে। সে প্রথমে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে সসৈন্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে শাহি ফৌজের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যুদ্ধ হল না, মির্জা সুলেমান পরাজয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। বাদশাহ বিজয়ী হয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং দুর্গের মধ্যে 'কসম ভবন' নামে এক প্রাসাদে বাস করতে থাকেন।

এই সময়ে হঠাৎই বাদশাহের শরীরে অসুস্থতা দেখা দেয়। সম্পূর্ণ একটি দিন ও রাত্রি তিনি জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছিলেন। পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি প্রথমেই মোনেম খানের ভ্রাতা ফাজেল বেগকে ইত্তেলা দেন এবং তাঁকে অবিলম্বে কাবুল যেতে আদেশ করেন। তিনি ফাজেল বেগকে বলে দেন যে, কাবুলের সকলে যেন অযথা চিন্তা না করে, তিনি এখন সুস্থ। বিষয়টি বেশ সংকটেরই ছিল কিন্তু খোদার অনুগ্রহে বাদশাহের সকল বিপদ কেটে যায় এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জাফর দুর্গ থেকে ফাজেল বেগের কাবুল রওনা হবার একদিন পর বাদশাহ ও কাবুলের দিকে যাত্রা করেন। কাবুল থেকে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে যে সমস্ত খবরাখবর ভক্করে মির্জা কামরানের কানে পৌঁছেছিল তাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে ভক্কর ছেড়ে পুনরায় কাবুলের দিকে অভিযান করেন এবং গজনি পৌঁছে সেখানকার শাসনকর্তা জাহেদ বেগকে হত্যা করেন।

সময়টা ছিল প্রত্যুষকাল। কাবুলের সমস্ত লোকজনই তখন নিদ্রায় বিভোর। সবেমাত্র নগরদ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। পথে পথে ভিস্তি ও সাফাই কর্মীদেরই কেবল আনাগোনা ছিল। মির্জা কামরান এই সুযোগে সাধারণ নগরবাসীর বেশে দুর্গে ঢুকে পড়েন। দুর্গে ঢুকেই প্রথমে হামাম খানার মধ্যে মোহাম্মদ আলি তায়লাকে হত্যা করেন তারপর মোল্লা আবদুল খালেকের নামাঙ্কিত মাদ্রাসার মধ্যে ঢুকে পড়েন।

বাদশাহ হুমায়ুন জাফর দুর্গ অভিযানকালে নওকারকে হারেমের দ্বাররক্ষীর দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। মির্জা কামরান সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন, দ্বারের প্রহরী কে? উত্তরে শুনলেন, নওকার। নওকার এই কথাবার্তা শুনেই বিপদ অনুমান করে এবং স্ত্রীলোকের বেশে মহল পরিত্যাগ করে। মির্জা কামরানের লোকজনেরা অন্য প্রহরীকে বন্দি করে তাঁর কাছে হাজির করল। এরপর মির্জার সৈন্যরা প্রধান ফটক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে লুটপাট করতে আরম্ভ করে। মির্জা কামরান বেছে বেছে কিছু রমণীদের মির্জা আসকরির প্রাসাদে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে তাদের এক জায়গাতে রেখে সামনে একটি দেয়াল তুলে দেন। ওই সমস্ত রমণীদের খাদ্য পানীয় ওই দেয়ালের ওপর থেকে সরবরাহ করা হত।

মির্জা ইয়াগদার নাসেরের আগেকার বাসভবনে খাজা মোয়াজ্জেমকে থাকতে দেওয়া হয় এবং তাঁর সমস্ত হারেমের বাসিন্দাদের বাদশাহ যেখানে থাকতেন, সেখানে পাঠানো হয়। এরপর মির্জা কামরান তাঁর পক্ষ ত্যাগকারী আমির, ওমরাহ ও সেনাধ্যক্ষদের স্ত্রী পরিজনদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন, তাদের সমস্ত সম্পদ লুঠ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেককে অন্যের হেফাজতে দিয়ে দেন।

বাদশাহ যখন সংবাদ পেলেন যে, মির্জা কামরান ভক্কর থেকে কাবুলে ফিরে এসেছেন



এবং এসে চতুর্দিকে অত্যাচার করে বেড়াচ্ছেন, তখনই তিনি জাফর কেল্লা তাঁর পুরানো কেল্লাদার মির্জা সুলেমানের হাতেই ন্যস্ত করে সেখান থেকে কাবুলের উদ্দেশে রওনা হন এবং ইন্দোরাব হয়ে কাবুলের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। বাদশাহ কাবুলের দিকে আসছেন এই সংবাদ পেয়েই মির্জা কামরান আমাকে এবং মাতা দিলদার বেগমকে তাঁর বাসস্থানে তলব করেন। মির্জা কামরান মাতা হজরতকে বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব বেগি বেগমের আস্তানায় চলে যেতে, আমাকে তাঁর কাছেই থাকতে বললেন। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললাম, আমার শ্রদ্ধেয়া মাতা যেখানে থাকবেন আমিও সেইখানেই থাকতে চাই। মির্জা কামরান তখন বললেন, তুমি নিজের হাতে খাজা খিজির খানকে একটা পত্র লিখে এখানে চলে আসতে বল। এখানে এসে সে যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কারণ মির্জা আসকরি ও মির্জা হিন্দালের মতো সেও আমার এক ভ্রাতা। আমার বিপদের দিনে আমাকে সাহায্য করা তার কর্তব্য। উত্তরে আমি জানালাম যে, খাজা খিজির খান (গুলবদন বেগমের স্বামী—অনু) আমার হস্তলিপির সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয়, কারণ আমি কদাপি তাঁকে কোনো পত্র লিখিনি। সে মাঝে মধ্যে আমাকে পত্র লেখে তাও আমার সন্তানদের প্রতিভূ হয়ে। আপনার যা মনোবাসনা তা আপনি স্বয়ং তাঁকে লিখে জানান। অতঃপর মির্জা কামরান মেহদি সুলতান ওমর আলিকে পাঠালেন খাজা খিজির খানকে আসার জন্য।

আমি এর আগেই খিজির খানকে পত্র লিখে বলেছিলাম যে, মির্জা কামরানের সঙ্গে তোমার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আছে অতএব তাঁর কথায় ভুলে তুমি যেন এসে আবার তাঁর দলে যোগ না দাও। আল্লাহ্‌র কাছে আমার সহস্র দোয়া এই যে তুমি যেন কোনো অবস্থাতেই বাদশাহের সঙ্গ পরিত্যাগ না কর।

আল্লাহ্‌কে অজস্র ধন্যবাদ যে, খাজা খিজির খানকে আমি যে অনুরোধ করেছিলাম, তা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। বাদশাহ যখন শুনলেন যে, মেহেদি সুলতান ও ওমর আলিকে মির্জা কামরান খাজা খিজির খানকে আনার জন্য পাঠিয়েছেন তৎক্ষণাৎ বাদশাহ ও তাঁর একজন বিশ্বস্ত লোককে খাজার কাছে পাঠালেন। খিজির খান এই সময় তাঁর নিজস্ব জায়গিরে কর্মব্যস্ত ছিলেন। বাদশাহের দূতকে খাজা বললেন, 'তুমি বাদশাহকে আশ্বস্ত করতে পার। আমি কখনোই মির্জা কামরানের পক্ষাবলম্বন করব না।'

শেষ অবধি খাজা খিজির খান বাদশাহের আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর পক্ষে যোগ দেবার জন্য জায়গির পরিত্যাগ করেন এবং আকাবিন নামক এক জায়গাতে তাঁর সঙ্গে বাদশাহের সাক্ষাৎ হয়।

বাদশাহ যখন কাবুলের উপকণ্ঠে কোহে মিনার পর্যন্ত পৌঁছে যান, তখন মির্জা কামরান তাঁর বাহিনী সাজিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মির্জা কামরানের বাহিনীর নেতৃত্বভার ছিল শেখ আফগানের পিতা শেরুবার হাতে। আমরা কেল্লার ছাদে উঠে উভয়পক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখছিলাম। প্রচণ্ড শব্দে যুদ্ধের কাড়া নাকাড়া বাজছিল এবং উভয় দলই যাচ্ছিল বাবা দস্তির দিকে। আমি মনে মনে বলছিলাম হে খোদা, এমন কোনোদিন যেন না আসে যেদিন কামরান যুদ্ধজয় করবে আর আমাদের অশ্রুসাগরে

AMARBOI.COM

মির্জা কামরানের বাহিনী যখন নিয়ে আফগানের কাছে পৌঁছায় তখন উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে পড়ে। শাহি ফৌজের অগ্রগামী ভাগ (কোরা দেলানে শাহি) মির্জা কামরানের বাহিনীকে পরাজিত করে। মির্জার পক্ষের অনেক সৈন্য শাহি ফৌজের হাতে বন্দি হয়। বন্দিদের বাদশাহের সামনে আনা হলে তিনি প্রত্যেককে হত্যা করার আদেশ দেন। মির্জা কামরানের অবশিষ্ট বাহিনীও শাহি ফৌজের কাছে বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচুর সৈন্য বন্দি হয়। বাদশাহ তাদের মধ্যে অনেককে কোতল করার আদেশ দেন এবং বেশ কিছুকে কারাগারে পাঠান। বন্দিদের মধ্যে মির্জা কামরানের প্রিয় সভাসদ জুকি খানও ছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর বাদশাহ মহাসমারোহে ঢাক ঢোল বাজিয়ে মির্জা হিন্দালকে সঙ্গে নিয়ে নগরের আকাবিনে প্রবেশ করেন এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে শিবির, দরবার ইত্যাদি সন্নিবেশ করেন। জমতান নামের সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় মির্জা হিন্দালের উপরে। মির্জা হিন্দাল সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন, অন্যান্য আমির ওমরাহদেরও বিভিন্ন দায়িত্বভার দেওয়া হয়। এরপর চলে কাবুলকে অবরোধ করে রাখা। বাদশাহ দীর্ঘ সাত মাস ধরে কাবুল নগরে অবরোধ বজায় রাখেন। শাহি ফৌজের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মির্জা কামরান একদিন রাত্রিতে প্রহরা অতিক্রম করে বাদশাহের শিবির এলাকায় ঢুকে পড়েন। তাঁর উপরে শাহি ফৌজ পিছন দিক থেকে গুলিবর্ষণ করে। গুলির শব্দে মির্জা কামরান অন্যত্র সরে পড়েন। এরপর গুলিবর্ষণে শাহি ফৌজের লোকজনদের হতাহত হবার সম্ভাবনা থাকায় বাদশাহের নির্দেশে গুলি বর্ষণ বন্ধ করা হয়। এরপর থেকে শাহি ফৌজ প্রাসাদের উচ্চতম তল থেকে (চিলেকোঠা) কখনোই গুলিবর্ষণ করত না কিন্তু মির্জার লোকজন কাবুল শহরের পিছনের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করত।

যুদ্ধের সময় শাহি ফৌজের অগ্রগামী অংশে মির্জা আসকরিকে রাখা হত। মির্জা কামরানের সৈন্যরা কেল্লার বাইরের প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করত এবং যুদ্ধে উভয় পক্ষের লোকজনই হতাহত হত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাহি ফৌজেরই জয় হত। যুদ্ধের এই সাফল্যের কারণে কেল্লায় অবরুদ্ধ সৈনিকরা কেল্লা ছেড়ে বাইরে এসে যুদ্ধ করার সাহস পেত না। হজরত বাদশাহও কেল্লায় অবস্থানকারী হারেমের রমণী, তাদের নাবালক পুত্র-কন্যাদের মুখ চেয়ে দুর্গে তোপ দাগতেন না এবং কেল্লার জল সরবরাহ ব্যবস্থাও অটুট রেখেছিলেন। অবরোধ দীর্ঘকাল ধরে বলবৎ ছিল এবং সেই কারণে অবরুদ্ধ নারী, শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছিল। অতঃপর দুর্গের অবরুদ্ধ লোকজন খাজা দোস্ত, যে ছিল মাদারিচার স্বামী, তাকে প্রতিনিধিরূপে বাদশাহ হুমায়ুনের দরবারে পাঠায়। খাজা দোস্ত অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের পক্ষ থেকে বাদশাহকে অনুরোধ করে যে মির্জা কামরানের যা অভিলাষ তা পূরণ করা হোক। আল্লাহর সৃষ্ট এই নিরপরাধ, নিরীহ মানুষজনের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট আর সহ্য করা যাচ্ছে না, আপনি তাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করুন।

বাদশাহ দুর্গবাসীদের আবেদন শুনলেন, তিনি বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে বেশ কিছু পোশাক পরিচ্ছদ, নব্বইটি মেষ এবং এক বোতল লেবুর আরক বাইরে থেকে দুর্গে প্রেরণ করলেন এবং এক পত্র লিখে দুর্গবাসীদের আশ্বস্ত করলেন যে, তাদের কষ্টের কথা তাঁর গোচরে আছে এবং তিনি অবরোধ শিথিল করবেন। অবরোধ চলাকালীন সময়ে দুই বছর বয়সি সুলতানা বেগমের মৃত্যু হয়। বাদশাহ আশঙ্কা করছিলেন যে, দুর্গের অবরোধ যদি কঠোর করা হয় তাহলে মির্জা কামরান হয়তো শাহজাদা আকবরকে বন্দি করতে পারে।

এত কিছু সত্ত্বেও কেল্লার ছাদে সন্ধে থেকে সারারাত অনেক লোকজন প্রহরায় থাকত এবং তারা শাহি ফৌজকে ভয় দেখানোর জন্যই হোক অথবা নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই হোক, প্রচুর হৈ হট্টগোল করত। কিন্তু যে সন্ধ্যায় মির্জা কামরান কেল্লা ছেড়ে পালিয়ে যায় সেদিন মাগরিবের নামাজ শেষ হয়ে এশার নামাজের সময়ও প্রায় অতিক্রান্ত, কিন্তু কেল্লার ছাদ থেকে কোনো বিশেষ সাড়াশব্দ শোনা গেল না। কেল্লার একেবারে ওপর তলার গম্বুজ থেকে সরাসরি নীচে নামার জন্য একটা সিঁড়ি ছিল। কেল্লার লোকজন সাধারণত সেই সিঁড়িটিই ব্যবহার করত, কিন্তু সেই সিঁড়িতেও বিশেষ ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়নি।

রাত্রিতে সকলেই যখন নিদ্রামগ্ন, হঠাৎই হৈচৈ এবং অস্ত্রের ঝনঝনিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমরা সকলেই তখন ভাবছি যে আবার বোধহয় নতুন কোনো আক্রমণ হল। জলুখানার সামনে তখন প্রায় হাজার খানেক লোকের জমায়েত হয়েছে। আমরা যখন নুতন এক বিপদের আশঙ্কায় কম্পমান, সেই অবসরে দেখলাম সমস্ত লোকই অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমন সময় কেরাচা খানের পুত্র বাহাদুর খান এসে খবর দিল যে মির্জা কামরান কেল্লা ছেড়ে পালিয়েছেন এবং খাজা মোয়াজ্জেম কেল্লার দেয়ালে টাঙানো দড়ির সাহায্যে ওপরে উঠে গেছেন। বেগম হামিদা বানু এবং আমাদের লোকেরা দরজা ভেঙে আমাদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করল। বেগা বেগম সকলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে যেতে বলল। আমি তাকে নিরস্ত করে বললাম, আমাদের আস্তানায় যেতে হলে অনেকটা আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করতে হবে। হয়তো এর মধ্যে মহামান্য বাদশাহের তরফ থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো লোকজনও এসে পড়তে পারে। ইতিমধ্যে বাদশাহের বার্তা নিয়ে অম্বর নাজের উপস্থিত হল এবং আমাদের জানাল যে আমরা যেন কক্ষমধ্যেই থাকি যতক্ষণ না বাদশাহ নিজে এসে পৌঁছাচ্ছেন। আরও কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বাদশাহ স্বয়ং উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে ও দিলদার বেগমকে বক্ষে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। এরপর হামিদা বানু ও বেগা বেগমকেও হজরত বাদশাহ আলিঙ্গন করলেন। তারপর বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা করলেন যে তার কোনো প্রিয়জন যেন এখানে না থাকে এবং এই জায়গা তাঁর শত্রুদের জন্যই যেন রক্ষিত থাকে। তিনি অম্বর নাজেরকে বললেন, 'একদিকে তুমি অন্যদিকে তরদি বেগ খান থাকবে আর তার মধ্য দিয়েই শাহি হারেমের রমণীরা নিরাপদ আশ্রয়ে যাবে। এক এক করে সমস্ত মহিলারাই সেই স্থান পরিত্যাগ করল। বাকি রাতটা আমরা সকলেই বাদশাহের সান্নিধ্যেই কাটালাম। দেখতে দেখতে রাত্রির অবসান হল। সকালে মাহ চুচক, খানেশ আগা ও অন্যান্য হারেম রমণীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল, আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে পরস্পর কুশল বিনিময় করলাম।

এরপর বাদশাহ হুমায়ুন বদখসানের দিকে যাত্রা করেন। এইসময় বেগম মাহ চুচকের গর্ভে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। যে রাত্রিতে চুচক বেগম সন্তান প্রসব করেন সেই

AMARBOI.COM

রাত্রিতে বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, আমার জননী বেগম ফখরুন্নেসা ও দৌলতবখ্‌ত দুয়ার খুলে বার হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হন এবং কোনো এক বস্তু তাঁর সমনে রাখেন। বাদশাহ নিজের মনে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন। যখন তিনি শুনলেন একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে তখন ওই দুজনের নামের অংশ নিয়ে সদ্যোজাত কন্যার নাম রাখলেন বখ্‌তেন্নেসা বেগম। বেগম মাহ চুচকের গর্ভে সর্বমোট ছয় সন্তানের জন্ম হয়, যার মধ্যে দুটি পুত্র সন্তান ও চারটি কন্যা। এদের নাম যথাক্রমে মোহাম্মদ কলিম মির্জা, ফররুখ খান মির্জা, বখ্‌তেন্নেসা বেগম, সকিনা বানু বেগম, আমেনা বানু বেগম এবং সালেহা বানু বেগম। বাদশাহ যখন পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান অভিযান করেন সেই সময়ও বেগম মাহ চুচক সন্তান সম্ভবা ছিলেন এবং তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মায় যার নাম হয় ফররুখ খান মির্জা। এরপর খানেশ আগার গর্ভেও এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় ইব্রাহিম সুলতান মির্জা।

বাদশাহ দেড় বছর কাবুলে আনন্দের সঙ্গে দিন যাপন করেন। তারপর তিনি বদখসানে চলে যান। ওখানে তিনি তালেকান নামের এক জায়গাতে বাস করছিলেন। বাদশাহের শিবিরের অবস্থান ছিল একটি সুরম্য উদ্যানের মধ্যে। একদিন তিনি যখন সবেমাত্র ফজরের নামাজ শেষ করেছেন, এমন সময় সংবাদ এল যে বাদশাহের অধিকাংশ আমির ওমরাহের দল তাদের আনুগত্য বদল করে মির্জা কামরানের দলে সামিল হয়েছে। এই পলাতক আমিরদের মধ্যে কেরাচা খান, মোসাহেব খান, মোবারেজ খান ও বাপুচ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্বাসঘাতকেরা রাত্রির অন্ধকারে শাহি শিবির ত্যাগ করে বদখসানে মির্জা কামরানের সঙ্গে মিলিত হয়। বাদশাহ বদখসানে অভিযান করেন এবং মির্জা কামরানের বাহিনীকে অবরোধ করেন।

অল্প সময় পরেই মির্জা কামরান পরাজয় স্বীকার করেন এবং সবিনয়ে বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হন। এরপর বাদশাহ সলামত মির্জা কামরানকে কোলাব অঞ্চল, মির্জা সুলেমানকে জাফর কেল্লা, মির্জা হিন্দালকে কান্দাহার এবং মির্জা আসকরিকে তালেকান অঞ্চলের শাসনভার দেন।

এরপর একদিনের ঘটনার বর্ণনা করি। বাদশাহের শিবির সন্নিবিষ্ট হয়েছে কস্‌মের ভিতরে। সেদিন সমস্ত ভাইয়েরা শিবিরে একত্রিত হয়েছিলেন। বাদশাহ হুমায়ুন, মির্জা কামরন, মির্জা আসকরি, মির্জা হিন্দাল এবং মির্জা সুলেমান সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ হুমায়ুন চেঙ্গিস খানের দরবারের প্রথা অনুসারে আফতাব অর্থাৎ জল এবং জলপাত্র আনতে আদেশ করে বললেন, এখানেই আমরা হাত ধুয়ে সকলে একসঙ্গে ভোজন করব আমাদের পুনর্মিলনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। প্রথমে বাদশাহ ও মির্জা কামরান হাত ধুলেন। মির্জা সুলেমান বয়সে মির্জা আসকরি ও মির্জা হিন্দালের চেয়ে বড়ো ছিলেন, সেজন্য উভয় ভ্রাতাই জলপাত্র মির্জা সোলেমানের দিকেই এগিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি অগ্রজের সম্মান প্রদর্শন করেন। মির্জা সোলেমান সেই জলপাত্রে হাত ধোয়ার পর নাকমুখও নানাভাবে ধুতে থাকেন। মির্জা আসকরি ও মির্জা হিন্দাল এতে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং বললেন বাদশাহের সামনে হাত ধোয়া কিংবা তাঁর সঙ্গে একাসনে বসে আহার করা এক



সম্মানের বিষয়। তাঁর আদেশ অমান্য করে এরকম সাহস কারও নেই। কিন্তু আপনি মির্জা সুলেমান এই সুন্দর পরিবেশকে নষ্ট করলেন। এখন ওই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন জলে আমরা হাত ধুতে অপারগ, এই কথা বলে উভয়ে শিবিরের অন্য কক্ষে গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন। মির্জা সুলেমান তাঁর ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়েছিলেন। এরপর সমস্ত ভ্রাতারা একত্রে একই দস্তরখানে বসে আহার করলেন। বাদশাহ ওই অনুপম অনুষ্ঠানে আমাকেও স্মরণ করেন। কথাপ্রসঙ্গে বাদশাহ ভ্রাতাদের বললেন, লাহোরে থাকার সময় আমাদের ভগিনী গুলবদন একবার আমাকে বলেছিল যে তার মনের একান্ত বাসনা, সে সকল ভ্রাতাদের একত্রে দেখবে। আজ সকাল থেকেই আমরা সব ভাইয়েরা একত্রে বসে আছি, হঠাৎই আমার গুলবদনের সেদিনের ইচ্ছার কথাটা মনে পড়ে গেল, তাই তাকেও এখানে আহ্বান করলাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের ভ্রাতাদের এই মিলনকে মঞ্জুর করছেন। কারণ তিনি অবগত আছেন যে আমাদের মনে কোনো প্রকৃত মুসলমানের ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই। সেখানে ভাইদের কোনো ক্ষতি করার চিন্তা তো বহু দূরের কথা। আমরা চিরদিন যাতে এই ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারি সেজন্য আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমাদের শক্তি প্রদান করবেন।

এরপর এই ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আবেগে চারদিকে আনন্দ উৎসবের যেন বান ডাকল। বাদশাহের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতাদের মিলনকে উপলক্ষ্য করে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ শিবিরের আমির ওমরাহদের মধ্যেও মৈত্রীর এক পরিবেশ তৈরি হল। এতদিন এরা হয়তো নানা সময়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কিংবা বৈরী ভাব মনে পোষণ করেছে, একে অপরের রক্তপাত ঘটাতে চেয়েছে, কিন্তু এই মহামিলনের দিনে বিগত দিনের সমস্ত তিক্ততা বিদ্বেষ ভুলে সকলেই একসঙ্গে আনন্দ উৎসবে সামিল হল।

বদখসান থেকে বাদশাহ কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে দেড় বৎসর কাটান। এরপর তিনি বলখ্ অভিযানের সংকল্প করেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে বাদশাহ বাগ-এ-দিলখুসা নামে এক উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করেন। উদ্যানের একেবারে নীচের দিকে ছিল শাহি মহল। বাদশাহের এক ওমরাহ কুলিবেগের বাসস্থান ছিল উদ্যানেরই একেবারে লাগোয়া। বাদশাহ সে জন্য হারেমে সমস্ত রমণীদের কুলিবেগের বাসভবনেই থাকার ব্যবস্থা করেন। আমরা বাদশাহকে শিবির সংলগ্ন বাগিচায় ফুটে থাকা 'রেওয়াজ' (এক রকমের ফুল)-এর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বেশ কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। উত্তরে বাদশাহ বললেন এইসব রেওয়াজ তো বাগিচায় মালির হাতে তৈরি। এরপর যখন লোক-লস্কর নিয়ে অভিযানে বের হব, তখন পাহাড়ি পথে অজস্র ফুটে থাকা রেওয়াজের সৌন্দর্যে তোমাদের চক্ষু সার্থক করে নিও।

একদিন আসরের নামাজের সময় বাদশাহ ঘোড়ায় চড়ে দিলখুসা বাগে এলেন। তাঁর যাত্রাপথ ছিল কুলিবেগের ভবনের পাশ দিয়ে আর সেখানেই শাহি পরিবারের রমণীরা বাস করছিলেন। বাদশাহ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন হঠাৎই সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হল এবং বাদশাহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকলেই উঠে দাঁড়াল এবং আদাব-সালাম জানাল। ফখরুন্নেসা বেগম এবং

AMARBOI.COM

আগে চলতে আরম্ভ করলেন। পাহাড়ের সানুদেশে একটি প্রবহমানা ঝর্না ছিল। ফখরুন্নেসা বেগম ঝর্না পার হতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর আফগানি আগাচাও ঝর্না অতিক্রম করতে গিয়ে ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে গেলেন। এইসব ছোটোখাটো দুর্ঘটনা এড়িয়ে বাদশাহের কাছে পৌঁছাতে আমাদের বেশ খানিকটা বিলম্ব হল। মাহ চুচকের ঘোড়া আবার দিকভ্রষ্ট হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। সমস্ত ঘটনায় বাদশাহ বেশ বিরক্ত বোধ করেন। রেওয়াজ ফুলের গাছগুলো বেশ উঁচুতে ছিল। এতটা পথ অশ্বপৃষ্ঠে এসে বাদশাহ একটু ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তিনি আমাদের এগিয়ে যেতে বললেন এবং নিজে ব্যস্ত হলেন খানিকটা আফিং সেবনের কাজে। আমরা পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য ও রেওয়াজ ফুলের সমারোহ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছিলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখি বাদশাহ আমাদের কাছাকাছি এসে পড়েছেন এবং তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। সেই রাত্রিটা ছিল জ্যোৎস্নালোকিত এক রাত। আমরা পরস্পর নানা কথা বলতে বলতে পথ চলছিলাম। খানেশ আগা, সাহাম আগা এবং আরও কয়েকজন গুনগুন করে গান করছিল। এভাবেই আমরা লোগমান পর্যন্ত এসে পৌঁছালাম। শিবিরের তোরণদ্বার তখনও অনেক দূরে। প্রথমেই আমরা পৌঁছালাম চাদর-এ-মেহেরে (বাদশাহের জন্য তৈরি বিশেষ শিবির)। হজরত বাদশাহ, বেগম হামিদা বানু এবং আমরা সেই চাদর-এ-মেহেরে রাত্রির দুই-তিন প্রহর কাটালাম। ভোর হতেই বাদশাহ রেওয়াজ ফুল দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমাদের অর্থাৎ মহিলাদের ঘোড়ার আস্তাবল ছিল একটু দূরে এক গ্রামে। সেখান থেকে ঘোড়া আসতে আসতে প্রাতর্ভ্রমণের সময় পার হয়ে যাবে — তাই বাদশাহ বললেন, 'কাছাকাছি যা ঘোড়া আছে তাই নিয়ে এসো।' ঘোড়া এসে গেল, বাদশাহ আমাদের এক এক করে সেগুলিতে উঠতে বললেন। বেগা বেগম ও মাহ চুচকের তখনও সাজসজ্জা শেষ হয়নি। তাদের বিলম্ব দেখে বাদশাহ বিরক্ত হচ্ছিলেন। আমি বাদশাহকে বললাম, হজরত আপনি অনুমতি করুন, আমি ওদের দুজনকে নিয়ে আসি। বাদশাহ বললেন, যাও এবং ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বল। আমি হারেমে প্রবেশ করে বললাম, আমি হজরত বাদশাহের সন্দেশ বাহক তোমাদের এত দেরি দেখে বাদশাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এরপর তারা দুজনে তাড়াতাড়ি সাজগোজ শেষ করে আমার সঙ্গে বাদশাহের সমীপে উপস্থিত হয়। হজরত বাদশাহ আমার সামনে এসে বললেন, গুলবদন, প্রাতর্ভ্রমণের উপযুক্ত সময় এখন আর নেই, এখন বের হলে তপ্ত বাতাস গায়ে লাগবে, তার চেয়ে ভালো হবে আমরা যদি জোহরের নামাজের পর বার হই। এরপর বাদশাহ হামিদা বানুর কক্ষে চলে গেলেন। জোহরের নামাজ শেষ করে ঘোড়া আসতে আসতে আসরের নামাজের সময় চলে এল। বাদশাহ হামিদা বানু বেগমের মহল থেকে বাইরে এলেন।

পাহাড়ি পথের ধাপে ধাপে রেওয়াজ ফুলের গাছ। সেগুলিতে তখন নতুন পত্রপল্লব ও মুকুল এসেছিল। আমরা সেই সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখে সময় অতিবাহিত করলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। সেখানেই বাদশাহের শিবির রচিত হল এবং আমরাও মহা আনন্দে বাদশাহের সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করলাম। পরদিন ভোরে বাদশাহ সকালের নামাজ শেষ করে একটু পদচারণা করতে বের হলেন। সেখান থেকে ফিরে বেগ বেগম, হামিদা বানু বেগম, মাহচুচক বেগম, আমাকে এবং অন্যান্য বেগমদের পৃথক পৃথকভাবে পত্র লিখলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল, আপনাদের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। এজন্য আমার কাছে আপনাদের মার্জনা চাওয়া উচিত। আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে ফরজা অথবা এস্তালিপে নিয়ে আপনাদের রাখব এবং সেখান থেকে শাহি কাফেলার সঙ্গে মিলিত হব। আর যদি আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহলে এখান থেকেই আপনাদের বিদায় জানাব। সমস্ত বেগমেরাই ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিল। বাদশাহও সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত বেগম এবং অন্যান্য মহিলাদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাত্রারম্ভ করেন এবং লগমান থেকে হাজরিতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে আমরা সকলে নিজেদের শিবিরে রাত্রি যাপন করি এবং সকালে উঠে প্রাতরাশের পর আবার যাত্রা শুরু করি। জোহরের নামাজের সময় আমরা ফরজা পৌঁছাই।

হামিদা বানু বেগম আমাদের জন্য নটি মেষ প্রেরণ করেন। আমরা ফরজা আসার কিছুকাল আগেই দৌলতবিবি ফরজা এসেছিলেন। তিনি অনেক মুখরোচক খাদ্যবস্তু বানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে দুধ, দই, ফিরনি ইত্যাদিও ছিল। ফরজায় প্রথম রাত্রিটা বেশ আনন্দেই কেটেছিল। পরদিন সকালে ফরজার আশপাশটা ঘুরে দেখার জন্য সকলে বের হলাম। ফরজাতে অনেকগুলি ঝর্না ছিল এবং সেগুলোর জলের স্বাদও ছিল মধুর। ফরজা থেকে আমরা গেলাম এস্তালিপে। এস্তালিপে বাদশাহ তিনদিন অপেক্ষা করে হিজরি ৯৫৮-তে বলখ্ অভিমুখে রওনা হন।

বলখের পথে কোতেল অতিক্রম করে বাদশাহ মির্জা কামরান, মির্জা সুলেমান ও মির্জা আসকরিকে শাহি ফরমান জারি করে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি এবার উজবেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি এসময় আমরা, ভাইয়েরা যে কত ঐক্যবদ্ধ তার প্রমাণ দেবার প্রয়োজন আছে। তোমরা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সত্বর আমার সঙ্গে এসে মিলিত হও। এই ফরমান পেয়ে মির্জা সুলেমান এবং মির্জা আসকরি বাদশাহের খিদমতে হাজির হন এবং বলখ্ অভিযানে সঙ্গী হন।

বলখে এসময় শাসনকর্তা ছিলেন পির মহম্মদ। প্রথমদিন তাঁর বাহিনী প্রতিরোধে নেমে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধে শাহি ফৌজেরই জয় হয়। পির মহম্মদের বাহিনী পরাজিত হয়ে শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। পরদিন সকালে পির মহম্মদ স্থির করলেন তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। শাহি ফৌজ প্রচণ্ড শক্তিশালী অতএব বলখ্ ত্যাগ করে যাওয়াই ভালো হবে। অন্যদিকে শাহি ফৌজের একজন পদস্থ আমির এসে বাদশাহকে বললেন যে, যেখানে বাদশাহি ফৌজের ছাউনি পড়েছে সে জায়গাটি আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। কোনো প্রশস্ত জায়গা দেখে ছাউনি ফেলা উচিত। সেইমতো কাজ শুরু হল। শাহি ফৌজের লোকদের ভারী ভারী মালপত্র স্থানান্তরিত করতে দেখে প্রতিপক্ষের মনে হল শাহি ফৌজ বোধহয় পরাজয়ের আশঙ্কায় পশ্চাদাপসরণ করছে। শাহি ফৌজের সৈনিকদের অনেকের মধ্যেও এই ভাবনা কাজ করছিল। হয়তো আল্লাহর ইচ্ছাও ছিল সেরকম। বাদশাহের সৈন্যদল কোনো যুদ্ধ না করে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

উজবেকেরা (বলখের শাসকেরা) যখন সংবাদ পেল যে শাহি [illegible] তখন

AMARBOI.COM

তারা মহানন্দে তাদের পিছু তাড়া করল। শাহি ফৌজের সঙ্গে মাঝে মধ্যে তাদের সংঘর্ষও হল কিন্তু তাতে উজবেকদের রোখা গেল না। এই সময় বাদশাহ কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। অবশেষে এমন একটা সময় এল যে দেখা গেল তাঁর স্বপক্ষীয়দের অধিকাংশই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে আর অন্যদিকে তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী উজবেকরাও এসে পড়ল প্রায়। নিরুপায় হয়ে বাদশাহ কুন্দুজের দিকে রওনা হন। কিছুদূর চলে বাদশাহ এক জায়গায় থামলেন এবং আমির ওমরাহদের ডেকে বললেন, আমার ভ্রাতারা এখনও কেউ এসে পৌঁছাল না। এ অবস্থায় আরও অগ্রসর হওয়া কী উচিত হবে? আপনারা আমার ভ্রাতাদের সন্ধান করুন। কিন্তু আমির ওমরাহদের মনে বাদশাহের বক্তব্যের কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না, তারা বাদশাহকে কোনো উত্তরও দিল না এবং তাঁর আজ্ঞা পালনেও কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করল না। ইতিমধ্যে কুন্দুজ থেকে সংবাদ এল যে বাদশাহের ভাইয়েরা শাহি ফৌজের পরাজয়ের খবর পেয়েছেন কিন্তু তাদের কে কোথায় আছেন, সে সম্বন্ধে কোনো সংবাদ নেই। এই সংবাদ শুনে বাদশাহ অত্যন্ত অধীর হয়ে ওঠেন তখন খিজির খাজা খান (গুলবদন বেগমের স্বামী) এগিয়ে এসে বললেন, আপনার আদেশ পেলে আমি তাদের সংবাদ আনার জন্য যেতে পারি। বাদশাহ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনার ওপর খোদাতাল্লার অসীম কৃপা বর্ষিত হোক, আমার মনে হয় আমার ভ্রাতারা কুন্দুজেই আছে।

দুদিন পর খাজা কুন্দুজ থেকে ফিরে এসে জানালেন, মির্জা হিন্দাল কুন্দুজেই আছেন এবং কুশলেই আছেন। এই সংবাদে বাদশাহ অত্যন্ত খুশি হন এবং মির্জা সুলেমানকে জাফর কেল্লায় পাঠিয়ে তিনি নিজে কাবুলের দিকে যাত্রা করেন।

মির্জা কামরান এসময় ছিলেন কোলাবে। তাঁর হারেমে বেগি নামের এক রমণী ছিল, যাকে লোকে বলত ডাইনি। মির্জা কামরানের ওপরে এই মেয়েটির অপরিসীম প্রভাব ছিল। সে মির্জাকে বলল, মির্জা যদি তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করতে চান তাহলে মির্জা সুলেমানের স্ত্রী এবং মির্জা ইব্রাহিমের মাতা হেরেম বেগমকে শাদি করা উচিত। হেরেম বেগম সম্পর্কে কামরান মির্জার শ্যালিকা ছিলেন। মির্জা এই ডাইনি মেয়ের কুহকে ভুলে তার কথামতো হেরেম বেগমকে উদ্দেশ করে এক প্রেমপত্র লিখলেন এবং প্রতীক উপহার ইত্যাদি দিয়ে বেগি আগাকে হেরেম বেগমের কাছে পাঠালেন। বেগি আগা অন্তরালে হেরেম বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মির্জা কামরানের মনোবাসনা ব্যক্ত করে চিঠি এবং উপহার দ্রব্য তাঁকে দিল। হেরেম বেগম সেই মুহূর্তে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বললেন, মির্জারা ফিরে এলে তাদের সামনে তিনি চিঠি এবং উপহার গ্রহণ করবেন। বেগি বেগম অনেক অনুনয় বিনয় করে বলল, এগুলো একান্তভাবে মির্জা কামরান আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বহুকাল ধরেই আপনার প্রণয় প্রার্থী আর আপনি তাঁর প্রেমের এই প্রতিদান দিচ্ছেন। বেগি বেগমের কথা শুনে হেরেম বেগম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বেগি বেগমকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়, তুমি কাসেদ (দূত) অথচ তুমি মির্জার হয়ে সুপারিশ করতে আরম্ভ করেছ। তিনি তৎক্ষণাৎ মির্জা সুলেমান ও মির্জা ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন, মির্জা কামরান তোমাদের পিতাপুত্রের ক্ষমতা কতটুকু তা জেনে ফেলেছে, না হলে সে আমাকে এধরনের পত্র লেখার সাহস পায় কী করে? সে আমাকে এতটাই হীন মনে করে যে দূতী পাঠিয়ে এধরনের ঘৃণ্য প্রস্তাব দেয়। মির্জা কামরান তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মির্জা সুলেমানের)। আমি তাঁর কন্যার সমান, তা সত্ত্বেও এধরনের কুপ্রস্তাব করতে সে ভয় পায় না। তোমরা যদি আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হও তাহলে এক্ষুনি দূতী সেজে আসা ওই মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে মির্জা কামরানের কাছে পাঠিয়ে দাও। যাতে ভবিষ্যতে সে অন্যের হারেমের স্ত্রীকন্যাদের প্রতি কুদৃষ্টি দিতে ভয় পায়। আমার উপযুক্ত পুত্র আছে তা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণে একটু ভয় হল না এরকম প্রস্তাব আমাকে পাঠাতে।

তৎক্ষণাৎ বেগি বেগমের শিরশ্ছেদ করা হল তারপর দেহটিকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলা হয়। এই ঘটনার পর মির্জা সুলেমান ও মির্জা ইব্রাহিমের সঙ্গে মির্জা কামরানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মির্জা সুলেমান তাঁর মনোভাবের কথা বাদশাহকে জানিয়েও দেন। দুজনের মধ্যেকার বৈরি সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বাদশাহের বলখ্ অভিযানের সময়। বাদশাহের ফরমান পেয়েও মির্জা কামরান বলখ্ অভিযানে যোগ দিলেন না।

এরপর কোলাবে মির্জা কামরান এতটাই দুর্বল ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন যে তখন তাঁর কাছে দরবেশ জীবন বেছে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তিনি তাঁর পুত্র আবুল কাসেম ইব্রাহিমকে মির্জা আসকরির কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে তালেকান অঞ্চলে চলে যান। কন্যা আয়েষা সুলতানা তাঁর সঙ্গে গেল। খানম বেগম ছিলেন মির্জার স্ত্রী। তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি অপর কন্যাটিকে নিয়ে পরে আমার কাছে এসো। এখন আমি সহায় সম্বলহীন, পায়ের নীচে একটু শক্ত জমিন পেলেই তোমাদের ডাকব। আপাতত তোমরা খোস্ত আর ইন্দেরাবে গিয়ে থাক। খানম বেগম উজবেক বংশীয়া ছিলেন। উজবেকদের মধ্যে বেগমের আত্মীয়স্বজন যারা ছিল তারা তাঁর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা জেনে ফেলল এবং তারা স্থির করল যে খানমকে নির্বিঘ্নে যেতে দেওয়া হবে না, হলে খানমের ভাইয়েরা জানতে পারবে এবং প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। তবে খানমের ধনসম্পদ, দাস-দাসী সবই লুঠ করা হবে। অনেক তিক্ততা, যন্ত্রণা সহ্য করে, ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে খানম বেগম উজবেকদের হাত এড়ায় এবং খোস্ত এবং ইন্দেরাবে চলে যায়।

এদিকে বলখের যুদ্ধে বাদশাহের পরাজয়ের সংবাদ মির্জা কামরানের কাছেও পৌঁছায় এবং তিনি নিশ্চিত বোধ করেন যে আপাতত বাদশাহ তাঁর প্রতি মনযোগী হবেন না। মির্জা কামরান অতঃপর কোলাব ত্যাগ করে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

বাদশাহ হুমায়ুন এসময় কাবুল ছেড়ে কিপচাক এলাকায় এসেছিলেন। এখানে তিনি একরকম নিঃশব্দে এসেছিলেন। শাহি হৈ হট্টগোল ছিল না। কামরান মির্জা তাঁকে এক উঁচু টিলা থেকে দেখতে পান এবং অতর্কিতে বাদশাহের উপরে হামলা করে বসেন। হয়তো আল্লাহ্‌র এরকমই অভিপ্রায় ছিল যে এক সহোদর ভ্রাতা আর একজন ভাইয়ের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে। আকস্মিক আক্রমণে বাদশাহ হুমায়ুন শারীরিকভাবে বেশ আঘাত পেলেন। বেশি আঘাত লেগেছিল তাঁর মাথায়। কপাল বেয়ে রক্তের স্রোত নেমে মুখমণ্ডল ভরিয়ে দিল। মরহুম বাদশাহ বাবুরও এরকমভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আহত হয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের এক যোদ্ধার অস্ত্রের আঘাতে বাবুরের মাথা জখম

AMARBOI.COM

হয়েছিল যদিও তাঁর শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি অক্ষত ছিল। আঘাতের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ অক্ষত রেখে মাথা ফেটে গিয়েছিল। বাদশাহ হুমায়ুনের অবস্থাও হয়েছিল সেইরকম। এরপর বাদশাহ কিপচাকদের পরাজিত করে বদখসান চলে যান। মির্জা হিন্দাল, মির্জা সুলেমান, মির্জা ইব্রাহিম এসময় বাদশাহের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা যে কোনো সময় মির্জা কামরানের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন। বাদশাহ তখন হেরেম বেগমের কাছে বার্তা পাঠালেন যে বদখসানে এখন যত সেনা আছে, তাদের অবিলম্বে আমার কাছে পাঠাও।

হেরেম বেগম কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করে নিজে তাদের সংগঠিত করেন। রণকৌশলের তালিম দেন এবং অবশেষে নিজে নেতৃত্ব দিয়ে সেই বাহিনীকে দোররা পর্যন্ত নিয়ে আসেন। সেখান থেকে সৈন্যদল বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশে রওনা দিল আর হেরেম বেগম একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকলেন। অল্পকালের মধ্যেই বদখসান থেকে আসা এই বাহিনী শাহি ফৌজে সামিল হয়। চারকারান ও ইয়াকারা বাগে কামরানের সঙ্গে শাহি ফৌজের মোকাবিলা হয়। যুদ্ধে ভাগ্য বাদশাহের সহায় হয় এবং পরাজিত হয়ে মির্জা কামরান নিঃস্ব এবং বিপন্ন অবস্থায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন।

মির্জা কামরানের নিষ্ঠুর ও ঈর্ষাপরায়ণ স্বভাবের জন্য তাঁর একান্ত আপনজনেরাও অখুশি ছিল। তাঁর জামাতা আক সুলতান প্রায়শই মির্জাকে বলত, আপনি অকারণে বার বার বাদশাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধাচারণ করেন কেন? কী আপনার উদ্দেশ্য? আমার তো মনে হয় বাদশাহের প্রতি আপনার ব্যবহার সঠিক নয়। আমার মত হল এই অকারণ যুদ্ধ করে প্রিয়জনদের রক্তপাত ঘটিয়ে কোনো লাভ নেই, আপনার উচিত সর্বান্তকরণে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করা। আমার এই প্রস্তাবে আপনি যদি অরাজি হন, তাহলে আমাকে বিদায় দিন। আপনার সঙ্গে যে আমার মতের কোনো মিল নেই তা অন্তত বাদশাহ কিংবা অন্য লোকেরা জানুক। মির্জা কামরান নিজ জামাতার কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেন, আমার অবস্থা কী এতই হীন হয়েছে যে তুমিও আমাকে উপদেশ দিতে সাহস কর। আক সুলতান মির্জার কথার প্রতিবাদ করে বলেন আমি উচিত কথাই বলেছি, আপনার পছন্দ না হলে আমি নিরুপায়। আমি এই মুহূর্তে আপনার পক্ষ এবং সঙ্গ উভয়ই ত্যাগ করলাম, না হলে আমার সমস্ত হালাল (বৈধ) বস্তু হারামে (অবৈধ) পরিণত হবে। এরপর আক সুলতান মির্জা কামরানের সঙ্গ ত্যাগ করে ভক্করের দিকে যাত্রা করে। মির্জা কামরানের কন্যা এবং আক সুলতানের স্ত্রীও স্বামীর অনুগমন করে। মির্জা কামরান ভক্করের শাসক শাহ হোসেনকে এক ফরমান মারফত বলেন যে, আক সুলতান অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে, সঙ্গে তার স্ত্রী অর্থাৎ আমার কন্যাও আছে। তাকে আটকাবে, তারপর যে কোনো কূটকৌশলে তাদের স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করবে। অতঃপর তাকে বলবে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে পারবে না। ফরমান পেয়ে শাহ হোসেন আক সুলতানের কাছ থেকে তার স্ত্রী হাবিবা বেগমকে ছিনিয়ে নেয় তারপর আক সুলতানকে মক্কা শরিফের দিকে যেতে দেয়।

www.amarboi.com

চারকারানের যুদ্ধে মির্জা কামরানের বিশিষ্ট সেনানায়ক কেরাচি খান নিহত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মির্জা কামরানের অনেক হিতৈষী আমির ওমরাহরাও মৃত্যুবরণ করে। কামরানের কন্যা আয়েষা সুলতান বেগম এবং দৌলত বখত আগা কান্দাহারের দিকে পালাবার চেষ্টা করে। দররা তাকিয়া হেমার অঞ্চলে বাদশাহের লোকজন তাদের আটক করে। মির্জা কামরান আফগানদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে।

বাগ-এ-নারঙ্গি বাদশাহের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। প্রতিবছরই সময় পেলে বাদশাহ তঙ্গিহা-তে গিয়ে এই উদ্যানটি পরিদর্শন করতেন। এবছর মির্জা হিন্দাল তঙ্গিহা-তে বাদশাহের সঙ্গী ছিলেন। এছাড়াও বেগা বেগম, মাহ চুচক, হামিদাবানু প্রভৃতি কয়েকজন বেগমও বাদশাহের সফর সঙ্গিনী হয়েছিলেন। আমার পুত্র সাদাত ইয়ার এসময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি বাদশাহের সঙ্গে যেতে পারিনি। তঙ্গিহা একটা সুন্দর পাহাড়ি এলাকা। বাদশাহ একদিন মির্জা হিন্দালকে সঙ্গে নিয়ে তঙ্গিহার নিম্নাঞ্চলে যে বনভূমি ছিল, সেখানে শিকার করতে যান। বাদশাহ ও মির্জা হিন্দাল ভিন্ন-ভিন্ন দিকে শিকার করছিলেন। একসময় বাদশাহ মির্জা হিন্দাল যেদিকে শিকারে ব্যস্ত ছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। মির্জা হিন্দালের শিকারের ভাগ্য সেদিন খুবই ভালো ছিল। তিনি প্রচুর জন্তু জানোয়ার শিকার করেছিলেন। বাদশাহকে সেখানে আসতে দেখে চেঙ্গিস খানের প্রথানুসারে সমস্ত শিকার হজরত বাদশাহের সম্মুখে রাখলেন। চেঙ্গিস খানের রীতি ছিল যুদ্ধে কিংবা শিকারে প্রাপ্ত অথবা লব্ধ সমস্ত জিনিস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সামনে পেশ করা। সমস্ত শিকার বাদশাহকে উপহার দেবার পর মির্জা হিন্দালের মনে হল বাদশাহ এবং বেগমদের ব্যবস্থা তো হল, কিন্তু ভগিনীদের জন্যও কিছু শিকার করা দরকার নাহলে তারা অভিযোগ করবে। তিনি আবার ঘন বনাঞ্চলে প্রবেশ করে শিকারের সন্ধান করতে লাগলেন। এইসময় মির্জা কামরানের পাঠানো এক আততায়ী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। মির্জা হিন্দাল মির্জা কামরানের এতদূর অধঃপতনের বিশেষ সংবাদ রাখতেন না, তাই তিনি তেমন সতর্ক হননি। আততায়ী তাঁর এই অসকর্ততার সুযোগে তাঁকে লক্ষ করে তির ছোঁড়ে। তির মির্জার বাহুতে বিদ্ধ হয়। আততায়ী পালাতে সক্ষম হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মির্জা হিন্দালের লোকজন এসে পড়ে এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে। হিন্দালের আহত হবার সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছাল। তিনি মির্জা হিন্দালের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মির্জা হিন্দাল কিন্তু শিকার অসমাপ্ত রেখে ফিরতে রাজি হলেন না। স্ত্রী, পরিজন, ভগিনীরা এবং সর্বোপরি বাদশাহ যাতে তাঁর জন্য চিন্তাগ্রস্ত না হন, সেজন্য এক পত্র লিখে পাঠালেন। পত্রে তিনি বললেন, বিপদ একটা সত্য সত্যই এসেছিল, কিন্তু তাকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

শীত ঋতু শেষ হয়ে আসছিল, গ্রীষ্ম পূর্ণরূপে প্রভাব বিস্তার করার আগেই বাদশাহ কাবুলে ফিরে আসেন। মির্জা হিন্দাল তাঁর বাহুর শরাঘাতটি নিয়ে প্রায় বছরখানেক ভুগেছিলেন।

এক বছর পর সংবাদ এল যে মির্জা কামরান আবার সেনাবাহিনী সংগঠিত করছেন এবং যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছেন। বাধ্য হয়ে বা

AMARBOI.COM

করলেন। তিনি মির্জা কামরানকে বাধা দেবার জন্য আবার সেই তশিহা-র দিকেই অগ্রসর হলেন এবং সেবারের মতো এবারও মির্জা হিন্দাল তাঁর সঙ্গী হন। বাদশাহের গুপ্তচরেরা প্রতিনিয়ত খবর আনছিল যে, যেকোনো মুহূর্তে মির্জা কামরান আক্রমণ হানতে পারেন বিশেষত রাতের অন্ধকারে। যে রাত্রিতে আক্রমণ হতে পারে এমন সংবাদ এল, সেই রাতে মির্জা হিন্দাল বাদশাহকে বললেন, হজরত! আপনি এই উচ্চাসনে বসুন এবং শাহজাদা জালালুদ্দিন মোহম্মদ আকবরকে আপনার পাশে রাখুন। আমরা সতর্কতার সঙ্গে আপনাকে পাহাড়া দেব। এরপর মির্জা হিন্দাল নিজের লোক-লশকরকে ডেকে বললেন, এতকাল তোমরা আমার যে সেবা, যে খিদমত করেছ তাকে দাঁড়িপাল্লায় একদিকে রেখে আজ রাত্রিতে তোমাদের সেবাকে অন্যদিকে রাখা হবে। যদি তোমরা আজ রাত্রিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারো, তাহলে তোমরা যা চাইবে আমি তোমাদের তাই দিতে কার্পণ্য করব না। মির্জার কথা শুনে সকলেই ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। এরপর মির্জা হিন্দাল প্রত্যেকের দায়িত্বভার বণ্টন করে নিজে সামরিক পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন। অস্ত্রশস্ত্র ভরা তোরঙ্গ ইত্যাদি যখন অশ্বপৃষ্ঠে তোলা হচ্ছিল, তখন হঠাৎই কে যেন চিৎকার করে উঠল। বাক্স-বরদার চিৎকার শুনে তার কাজ বন্ধ করে চিৎকারের হদিস খোঁজার চেষ্টা করছিল। মির্জা হিন্দাল দেরি দেখে আবার লোক পাঠালেন জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি আনার জন্য। বাক্স-তোরঙ্গ ইত্যাদি এল, মির্জা দেরির কারণ জানতে চাইলে বরদার বলল, সে একটা চিৎকার শুনে থমকে গিয়েছিল, তাই এত দেরি হয়েছে। মির্জা হিন্দাল তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, আসলে তোমরা যুদ্ধের ভয়ে পালাতে চাইছ। তোমরা মিথ্যেই ভয় পাচ্ছ। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে হয় যুদ্ধে জিতব না হয় শাহাদত বরণ করার গৌরব অর্জন করব। তারপর মির্জা আরও বললেন, তোমরা সাক্ষি থাকো, এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত হারাম বস্তু বর্জন করলাম এবং সমস্ত অন্যায় দুষ্কর্মে তওবা করলাম। এরপর সমবেত সৈনারা ফাতেহা পাঠ করল এবং মির্জা হিন্দালের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিল। মির্জা বললেন আমার নিমচা জামাহ (যুদ্ধের পরিধেয়) এবং জ্যাবশ্‌তর আনো। তারপর মির্জা পরিখার কাছে গিয়ে সৈনিকদের আবার উদ্দীপ্ত করলেন। হঠাৎ মির্জার এক সৈন্য পরিখার মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল, অন্ধকারের সুযোগে দুশমন আমাদের ওপরে হামলা করেছে। একথা শুনেই মির্জা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং সকলকে বললেন, আমার তবকচিকে দুশমন আক্রমণ করেছে এখনই তার সাহায্যে যেতে হবে এই কথা বলে মির্জা পরিখায় নামলেন, কিন্তু সৈন্যদের কেউই তাঁর সাহায্যে নামল না। মির্জাকে একা পেয়ে শত্রুরা তাঁর উপরে হামলা করল এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি সত্য-সত্যই শাহাদত বরণ করলেন।

আমি জানতাম না যে মির্জা হিন্দালের মতো একজন সজ্জন মানুষকে যে হত্যা করেছে সেই ঘাতক নরপিশাচটি কে? এর বদলে যদি আমার পুত্র সাদাত ইয়ার খান অথবা স্বামী খিজির খাজা খানের মৃত্যু হত, তাহলেও বোধহয় এত দুঃখ হত না। তরবারির আঘাত আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এই দুঃখ এই শোক আমি কী করে ভুলব। এ যেন দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্য হঠাৎই মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল। মির্জা হিন্দাল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাদশাহ হুমায়ুনের সম্ভ্রম, মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মির বাবা দোস্ত মির্জার নিষ্প্রাণ দেহ পরিখার ওপরে তুলে আনে। মির্জার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হল। শিবিরের দরজায় প্রহরী দাঁড় করিয়ে তাকে বলে দেওয়া হল যে কোনো সাক্ষাৎ প্রার্থী এলে বলবে, মির্জা খুবই আহত, বিশ্রাম নিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ হবে না। মির্জা জখম হয়েছেন, বাদশাহের কাছেও এই মর্মেই সংবাদ গেল। বাদশাহ তখনই প্রিয় ভ্রাতাকে দেখার জন্য ঘোড়া আনতে আদেশ করলেন। মির আবদুল হাই তাঁকে সবিনয়ে জানাল যে মির্জা খুবই আহত। চিকিৎসক কোনোরকম সাক্ষাৎকারও নিষিদ্ধ করেছেন। বাদশাহ তার কথায় বিপদের আভাস পেলেন, অনেক চেষ্টা করলেন নিজেকে সামলাবার। কিন্তু পারলেন না, অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমার স্বামী খিজির খাজা খান তখন তাঁর জায়গির জুশাহিতে ছিলেন। তাঁকে সংবাদ দিয়ে আনা হল এবং বলা হল যে মির্জার দেহ জুশাহিতে নিয়ে গিয়ে যেন কবর দেওয়া হয়। উটের পিঠে মির্জা হিন্দালের মৃতদেহ আর সেই উটের রাশি ধরে চলছিলেন খাজা খিজির খান। শোকে দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েছেন শুনে বাদশাহ তাঁকে বার্তা পাঠালেন, ধৈর্যের সঙ্গে এই শোকের মোকাবেলা কর। শোকে আমার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে কিন্তু শত্রুদের কথা ভেবে আমার শোককে হৃদয়ে দাফন করে রেখেছি। দুশমনরা নিকটেই আছে, অতএব বর্তমানে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাদশাহের কাছ থেকে সান্ত্বনা বার্তা আসার পর খাজা নিজেকে সংযত করে মির্জা হিন্দালের মৃতদেহ জুশাহিতে নিয়ে আসেন। সেখানে দাফন কাজ সমাধা করে আবার ফিরে বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হন।

ভ্রাতৃঘাতক, নরপিশাচ মির্জা কামরান সে রাত্রিতে না আসলে এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটত না। সে ছিল ঘরভেদী ইঁদুর। খানদানের দুশমন। হজরত বাদশাহ সমস্ত খবর জানিয়ে কাবুলে পত্র লিখলেন। মির্জা হিন্দালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর ভগিনীরা এতই শোকাকুল হয়ে পড়েন যে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমস্ত নগরীই যেন শোক পালন করল। নগরীর প্রতিটি ইট, কাঠ থেকেই যেন ক্রন্দনের রোল ভেসে আসছিল। গুলচেহেরা বেগম কেরাচা খানের বাসভবন থেকে এই দুঃসংবাদ বয়ে আনেন। খবর পেয়ে সারা মহল জুড়ে শোকের মাতম আরম্ভ হল। মির্জার ভগিনীরা পরস্পরের গলা জড়িয়ে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল। শোকে মুহ্যমান হয়ে কেউ কেউ শয্যা নিল, কেউ বা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিষ্ঠুর মির্জা কামরানের কী দুর্ভাগ্য, সে নিজের হাতে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করল। এরপরও মির্জা কামরানের কোনো অনুশোচনা হয়নি, সে নিজেকে পরিবর্তিত করেনি।

মির্জা কামরান তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল ধ্বংস আর অমঙ্গলের দিকে, ফলে সৌভাগ্যও তাকে ত্যাগ করে যায়। অর্থ, যশ সবকিছুই সে একে একে হারাতে থাকে। মনে হচ্ছিল, মির্জা হিন্দালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ভবিষ্যৎও অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে চলেছে। মির্জা কামরান এরপর পালিয়ে শেরশাহের পুত্র সেলিম শাহের কছে পৌঁছায়। সেলিম শাহ দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক হাজার টাকা দেন, মির্জা কামরানও তার দুঃখের কথা শাহকে শুনিয়ে কোনো একটি কোমক (জায়গির) প্রার্থনা করে। সেলিম শাহ তৎক্ষণাৎ মির্জার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না, তিনি নিজের আমির ওমরাহদের

AMARBOI.COM

ভাইকে হত্যা করতে পারে সে কোনো সাহায্য পাবার অধিকারী নয়, এমনকি এ ধরনের লোকের বেঁচে থাকারও কোনো অধিকার নেই। সেলিম শাহর এই কথাবার্তা মির্জা কামরান জানতে পারে। এরপর সে নিজের লোকজনকেও কিছু না জানিয়ে রমণীর বেশ ধরে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মির্জার পলায়নের সংবাদ পেয়ে সেলিম শাহ তার অবশিষ্ট লোকজনদের বন্দি করেন।

মির্জা কামরান সেলিম শাহর দরবার থেকে পালিয়ে ভেরা হয়ে খোশবে এসে পৌঁছায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, সেখানে আদম গখ্খর তাকে বন্দি করে এবং বাদশাহের দরবারে সোপর্দ করে।

এরপর সমস্ত হারেম রমণীরা, বিভিন্ন সুবার শাসক, আমির ওমরাহ, মির্জা কামরানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সৈনিক ও প্রজা, সকলে মিলে বাদশাহের কাছে নিবেদন করল যে, রাজ্যশাসনের প্রশ্নে ভ্রাতৃত্ব গৌণ। মির্জা কামরানের মতো ভাইয়ের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতে হলে বাদশাহের উচিত শাসনভার ত্যাগ করা, আর যদি শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখাই প্রধান হয়, তাহলে অপরাধী ভাই হলেও শাস্তি পাবার যোগ্য। এই মির্জা কামরানই একদিন আপনার মাথায় আঘাত করেছিল। ছলচাতুরিতে আফগানদের বিভ্রান্ত করে বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়েছে। সর্বোপরি মির্জা হিন্দালের মতো মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই মির্জার হঠকারীতার জন্যই চাঘতাই বংশের এত লোক মৃত্যুকে বরণ করেছে। এই মির্জার জন্য কত নিরপরাধ লোক স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, তার অত্যাচারের শিকার হয়েছে। আমরা এই নরঘাতককে ভবিষ্যতে আবার আমাদের উপরে অত্যাচার করার সুযোগ দিতে চাই না। আমরা নিজেরা, আমাদের পরিবার পরিজন, অর্থ সম্পদ সবই বাদশাহের খিদমতে উৎসর্গীকৃত। এই কুলাঙ্গার মির্জা কামরান আপনার ভাই নয় আপনার শত্রু। এই হত্যাকারীর অবশ্যই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। দরবারে সমস্বরে সকলে বলে উঠল এই খুনি মির্জার শিরকালাম (শিরশ্ছেদ) করা হোক।

বাদশাহ সকলের কথা শুনলেন, তারপর বললেন, আমি আপনাদের মনের ব্যথা বুঝি এবং তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত্য হয়েও বলছি, আমার মন এই সাজা অনুমোদন করছে না।

উপস্থিত সকলে হৈহৈ করে উঠল, বলল, আমরা ওই খুনির প্রাণদণ্ডই চাই। অতঃপর বাদশাহ বললেন বেশ, তোমাদের সকলের যদি এই মতই হয় তাহলে একটা কাগজে তোমাদের মতামত লিখে আমাকে দাও। বাদশাহের কথা শোনামাত্র আমির ওমরাহরা একটা কাগজ সংগ্রহ করে তাতে লিখলেন 'খুনি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মির্জা কামরানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।'

বাধ্য হয়ে বাদশাহ সম্মত হলেন তবে প্রাণদণ্ড নয় পরিবর্তে মির্জা কামরানের চক্ষু উপড়ে নেওয়া হবে। রাহতাস পৌঁছে সৈয়দ মোহাম্মদকে নির্দেশ দেওয়া হল মির্জা কামরানের দুচোখের পর্দা সেলাই করে দেবার জন্য। সৈয়দ মোহাম্মদ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করেন। মির্জা কামরানকে অন্ধ করে দেবার পর ......... এখানেই পাণ্ডুলিপির সমাপ্তি।

★

## পরিশিষ্ট

গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' যেখানে শেষ হয়েছে, ইতিহাস তার আপন নিয়মেই তার পরেও অগ্রসর হয়েছে। 'হুমায়ুননামা'-র হঠাৎ এধরনের খণ্ডিত সমাপ্তি দেখে মনে হয় গ্রন্থের শেষের দিকের কিছু অংশ হারিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে গুলবদন বেগমের নিজস্ব অবস্থার কথাও। গুলবদন বেগমকে আবার পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের সময়ে। সম্রাট আকবর এই পিতৃস্বসাকে বিশেষ সম্মান শ্রদ্ধা করতেন। শাহি খানদানে এক বিশেষ পদমর্যাদা ভোগ করতেন গুলবদন বেগম।

কামরান মির্জার চোখ নস্ট করে দেবার পর তিনি মক্কায় হজ করতে যান। এর চার বছর পর বাদশাহ হুমায়ুন যথেস্ট শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর পিতা সম্রাট বাবুরের মতোই কাবুল থেকে হিন্দুস্থান অভিযান করেন। শেরশাহ সুরির মৃত্যুর পর দিল্লির পাঠান-আফগান শাসন ব্যবস্থা যথেস্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল যার ফলে বাদশাহ হুমায়ুন এক বছরের মধ্যেই দিল্লি পুনর্দখল করতে সমর্থ হন। সময়টা ছিল ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। দুঃখের বিষয় বাদশাহ হুমায়ুন দ্বিতীয়বার দিল্লির মসনদে আসীন হয়ে বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৬৬৬ সালের ২৭ জানুয়ারি, শুক্রবার বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। এরপর আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের কাল। সম্রাট আকবরকেও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্মিলিত পাঠান শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁর পিতার মতো ছিল না। ওই যুদ্ধে মুঘলদের জয় হয়েছিল এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দুস্থানে মুঘল শাসন বলবৎ ছিল।

হিন্দুস্থানে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মির্জা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবুর মধ্য এশিয়ার ফরগনা অঞ্চলের শাসক ছিলেন। পিতা উমর শেখ মির্জার মৃত্যুর পর মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি রাজ্যভার লাভ করেছিলেন। বাবুরের বংশকে যদিও ইতিহাসে মুঘল বংশ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তাঁরা নিজেরা মুঘল নামে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন না। 'মুঘল' শব্দটি মঙ্গোল থেকে আসার কারণেও এই অনীহা হতে পারে। তাঁরা নিজেদের চাঘতাইয়া বংশ বলে বারলাস তুর্কি অর্থাৎ তৈমুর বংশের সঙ্গে যোগসূত্রের পরিচয় দিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। একদা দিল্লি শহরে নরহত্যার অনন্য নজির সৃষ্টিকারী তৈমুরলঙ্গকে গুলবদন বেগম তাঁর 'হুমায়ুননামা'-য় 'মহান' আখ্যা দিয়েছেন। মধ্য এশিয়ার বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য মোঙ্গল অধিপতি চেঙ্গিস খানের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য তাঁর পুত্র পৌত্রদের মধ্যে ভাগ হয়। চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র জাগতাই-এর ভাগে আসে বোখারা সমরখন্দ ইত্যাদি এলাকা। পৌত্র হুলাগু অভিযান করেন ইরানে। মোঙ্গল আক্রমণের সময় এখানকার মুসলমান শাসকেরা শিয়া মতাবলম্বী ছিল, কিন্তু মোঙ্গল পরবর্তীকালে এখানকার লোক সুন্নি

AMARBOI.COM

শিয়াপন্থীদের সংখ্যাধিক্য ছিল। যেহেতু মোঙ্গলদের নিজস্ব ধর্মমত খুব একটা শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেজন্য চেঙ্গিস পরবর্তী মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল শাসকেরা বিজিত প্রজার ধর্ম ইসলামের অনুগামী হয়।

ফরগনার অধিপতি মির্জা বাবুরকে তাঁর কৈশোর কাল থেকেই যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হয়। বাবুরের প্রথম বিবাহ হয় আয়েষা বেগমের সঙ্গে। এই বিবাহ স্থির হয়েছিল দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে, কিন্তু আয়েষা বেগম সমরখন্দে বিপক্ষ শক্তির হাতে বন্দি ছিলেন। কাব্য কাহিনির নায়কের মতোই মির্জা বাবুর সমরখন্দ অবরোধ করেন এবং সেখানকার শাসকদের পরাজিত করে নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। কিন্তু মির্জা বাবুরের এই প্রথম বিবাহ বিশেষ সুখের হয়নি। মির্জা বাবুর যখন ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে বিপর্যস্ত, প্রায় পলাতক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন, তখনই তাঁর এই স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। যে সমরখন্দ শহর অবরোধ করে বাবুর একদিন তাঁর বাগ্‌দত্তাকে উদ্ধার করেছিলেন ভবিষ্যতে সেই সমরখন্দে বাবুর নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। উজবেক সুলতান শয়বানি খানের কাছে বাবুর এমনভাবে পরাজিত হন যে, তাঁর রাজ্যের সঙ্গে সম্মানও হারাতে হয়। মির্জা বাবুরের জ্যেষ্ঠ ভগিনী ছিলেন খানজাদা বেগম। অত্যন্ত সুন্দরী, শিক্ষিতা পরিশীলিত এই মহিলাকে বাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান শয়বানি বেগ খানজাদা বেগম-এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন যা বাবুরের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। সমরখন্দে বাবুর যখন অবরুদ্ধ তখন ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য খানজাদা বেগম প্রৌঢ় শয়বানি খানের বেগম হতে রাজি হন। ভিন্ন মতে শয়বানি খান বাবুরকে পরাজিত করে একরকম বলপূর্বকই খানজাদা বেগমকে বিয়ে করেন। গুলবদন বেগম কিন্তু তাঁর 'হুমায়ুননামা'-তে এই বিবাহ উভয় পক্ষের সম্মতিতে ঘটেছিল বলে বর্ণনা করেছেন যা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে মেলে না। বাবুর এরপর যখন একরকম যাযাবর জীবন যাপন করতে করতে ভাগ্যান্বেষণে কাবুল উপত্যকায় আসেন তখন ইরানের শাহ ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধে শয়বানি খান পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর সম্পূর্ণ হারেম শাহ ইসমাইলের অধিকারে আসে। বাবুর শাহ ইসমাইলকে পত্র লিখে খানজাদা বেগমকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন এবং শাহ ইসমাইল সেই অনুরোধ রক্ষা করে খানজাদা বেগমকে বাবুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী কালে খানজাদা বেগমের আবার একটি বিবাহ হয়। সম্রাট আকবরের শৈশবে এই মহিলা তাঁর দেখাশোনা করেছেন। আফগান উপত্যকায় এসে বাবুর আবার বিবাহ করেন এবং তাঁর এই স্ত্রীর নাম ছিল মহম বেগম। তিনি বাবুরের বিশেষ প্রিয় মহিষী ছিলেন তদুপরি তিনিই ছিলেন উত্তরাধিকারী অর্থাৎ সম্রাট হুমায়ুনের জননী। বাবুরের আরও দুই স্ত্রী ছিলেন। কাবুল উপত্যকায় বাবুরের পদার্পণের আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের নাম ছিল যথাক্রমে জয়নাব ও মাসুমা বেগম। খোরাসানে মহম বেগমের সঙ্গে বিবাহের পর বাবুরের আরও দুটি বিবাহ হয়েছিল এবং সেই স্ত্রীদের নাম ছিল দিলদার বেগম ও গুলরুখ বেগম। এছাড়াও আফগানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাদের এক কন্যাকেও বাবুর বিবাহ করেছিলেন যার নাম ছিল আফগানি আগাচা। গুলরুখ বেগমের গর্ভে বাবুরের দুই পুত্র মির্জা কামরান ও মির্জা আসকরির জন্ম হয়েছিল। দিলদার বেগমের গর্ভে বাবুরের পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়, যাদের মধ্যে দুজন পুত্র ও তিনজন কন্যা। প্রথম সন্তান হয় কন্যা যার নাম ছিল গুলরং (গোলাপের রং) পরের কন্যার নাম গুলচেহেরা (গোলাপের মতো দেখতে) তারপর এক পুত্র সন্তান মির্জা হিন্দাল তারপর এক কন্যা গুলবদন বেগম (গোলাপি আনন) সর্বশেষ মির্জা আলোয়ার নামে এক পুত্র, অল্প বয়সেই তার মৃত্যু হয়। দিলদার বেগমের এই তৃতীয় কন্যা গুলবদন বেগমই 'হুমায়ুননামা'-র রচয়িতা। বাবুর যখন হিন্দুস্থান জয় করেন গুলবদন বেগমের বয়স তখন দুইয়ের সামান্য কিছু বেশি। আবছা স্মৃতিপটে তিনি দেখেছেন পিতার যুদ্ধযাত্রা। পানিপথের যুদ্ধে বাবুরের পক্ষে বারো হাজার সৈন্য ছিল গুলবদন বেগম অনবধানতাবশত যাকে উল্লেখ করেছেন বারোশো বলে। বিপরীতে ইব্রাহিম লোদির পক্ষে ছিল লক্ষাধিক সৈন্য এবং অসংখ্য রণহস্তী যা মুঘলদের হৃদকম্পণের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে মির্জা বাবুরের পক্ষে একটা জিনিস ছিল যা পাঠান সুলতানের ছিল না, তা হল কামান। এই কামানই ওই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করেছিল বলা যায়।

মহম বেগমের তুলনায় বাবুরের অন্যান্য বেগমদের যথেষ্ট নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। মহম বেগম তাঁর সপত্নী দিলদার বেগমের কাছ থেকে মির্জা হিন্দাল এবং গুলবদনকে চেয়ে নিজের কাছে রাখেন এবং নিজের সন্তানের মতোই তাদের প্রতিপালন করেন। সেই কারণেই গুলবদন বেগমের সঙ্গে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুমায়ুনের যথেষ্ট নৈকট্য গড়ে ওঠে। হুমায়ুনের রাজত্বকালে গুলবদন বেগম আগ্রাতে কাটিয়েছেন এবং শাহি খানদানের অভ্যন্তরীণ কলহ, ষড়যন্ত্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শেরশাহ সুরির হাতে হুমায়ুনের প্রথম পরাজয়ের পর আগ্রাস্থিত শাহি হারেমের মেয়েদের নিয়ে কাবুল যাত্রা করেন। গুলবদন বেগমও তাদের সঙ্গে ছিলেন। শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধে হুমায়ুনের সঙ্গে থাকা শাহি হারেম শেরশাহের হাতে বন্দি হয়, যার মধ্যে ছিলেন হুমায়ুন পত্নী বেগা বেগম। ওই যুদ্ধে হুমায়ুনের এক কন্যাসন্তান আকিকা বেগমেরও মৃত্যু হয়।

'চৌসা' এবং 'কনৌজের' যুদ্ধে শেরশাহ সুরির কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুনের চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং তাঁর পিতা বাদশাহ বাবুরের মতোই আশ্রয়ের সন্ধানে দিকে দিকে ঘুরতে হয়। বাবুর হিন্দুস্থানে অভিযান চালাবার আগে যে দৃঢ় পশ্চাদভূমি আফগান উপত্যকায় তৈরি করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে মির্জা কামরানের অধিকারে এবং তাঁর অগ্রজ হুমায়ুনের একরকম চির শত্রু ছিলেন বলা যায়। বাদশাহ এই দুর্দশার দিনগুলিতে গুলবদন বেগম ছিলেন কাবুলে, কামরান মির্জার আশ্রয়ে। যতদূর মনে হয় মির্জা কামরানও এই ভগিনীকে মোটামুটি স্নেহ করতেন। কারণ স্বরূপ বলা যায় মির্জা কামরান অন্যান্য মহিলাদের ধনরত্ন কেড়ে আত্মসাৎ করলেও গুলবদন বেগমের সঙ্গে সেরকম অনুচিত কোনো ব্যবহার করেননি। এর আর-একটা কারণ হতে পারে যে মির্জা কামরান গুলবদন বেগমের স্বামী খাজা খিজির খানকে শত্রু করে তুলতে চাননি। খাজা খিজির খান গুলবদন বেগমের স্বামী হবার সুবাদে জায়গির ইত্যাদি পেয়েছিলেন। তবে 'হুমায়ুননামা' পড়ে মনে হয় তিনি

AMARBOI.COM

তেমন বিশেষ উদ্যোগী অথবা রণনিপুণ ছিলেন না, যার জোরে শাহি দরবারে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করা যায়। তবে খাজা খিজির খান চরম বিপর্যয়েও বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি তাঁর আনুগত্য পরিবর্তন করেননি। বাদশাহ তাঁকেই মির্জা হিন্দালের শেষকৃত্যের ভার অর্পণ করেছিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন পরাজিত হিন্দুস্থান ত্যাগ করার পর বেগম হামিদা বানুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহে মির্জা কামরানের আপত্তি ছিল। হুমায়ুন যখন একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে বালুচিস্তানের বোলান গিরিপথ হয়ে ইরানে গিয়ে আশ্রয় নেন তখন হামিদা বানু বেগম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশের অমরকোটে বেগম হামিদা বানু এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন যার নাম রাখা হয় মুহম্মদ জালালুদ্দিন আকবর। বাদশাহের ইরান প্রবাস কালে শিশু শাহজাদা আকবর মির্জা আসকরির হেফাজতে ছিলেন। ইরান প্রবাস বাদশাহ হুমায়ুনের তেমন সুখের না হলেও তা ছিল বাধ্যতামূলক। প্রথমত ইরানিরা শিয়া মতাবলম্বী এবং তৈমুর বংশীয়রা সুন্নি, তাছাড়া আশ্রয়দাতা ও আশ্রয় প্রার্থীর পার্থক্য তো ছিলই। এই পর্যায়ের যে সমস্ত ঘটনা গুলবদন বেগম তাঁর 'হুমায়ুননামা'-য় ব্যক্ত করেছেন তার অধিকাংশই তিনি শুনেছেন বেগম হামিদা বানুর কাছ থেকে। হামিদা বানুর সঙ্গে গুলবদন বেগমের আমৃত্যু সখ্যতা ছিল। পরে বাদশাহ হুমায়ুন বিজয়ী হয়ে কাবুলে আসার পর আবার ভগিনী গুলবদন বেগমের সঙ্গে দেখা হয়। বাদশাহ হুমায়ুনের জীবনের ঘটনাপঞ্জী নিয়ে 'হুমায়ুননামা' লিখতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন সম্রাট আকবর। অথচ কী আশ্চর্য ওই সময়ে ওই বিষয়েই 'তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন জহর আফতাবচি। আফতাবচি অর্থাৎ জলবাহক। জহর বাদশাহ হুমায়ুনের জলপাত্র বহন করতেন এবং চরম বিপদের দিনেও তিনি বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। তবে তাঁর রচনায় বাদশাহ হুমায়ুনের বৈচিত্র্যময় জীবনের বহিরঙ্গই শুধু ধরা পড়েছে। পারিবারিক সম্বন্ধ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়গুলি আবার অনেক সুস্পষ্ট হয়েছে গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা'-তে।

আগেই বলা হয়েছে যে গুলবদন বেগম সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। তিনি সুরাট থেকে জাহাজে করে মক্কায় গিয়ে হজ সম্পূর্ণ করে হিন্দুস্থান ফিরে এসেছিলেন। এমন তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেইসময়ে শাহি পরিবারের মহিলাদের মধ্যে যে যথেষ্ট লেখাপড়ার চর্চা ছিল, 'হুমায়ুননামা' তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক দিনে গুলবদন বেগমের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর স্বয়ং তাঁর শব যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন।

গুলবদনের 'হুমায়ুননামা' হয়তো কোনো মহৎ সাহিত্যকৃতি নয়, নয় কোনো সঠিক তথ্য ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ। তবুও লেখিকার একান্ত স্মৃতিচারণায় মূর্ত হয়ে ওঠে সেই সময় এবং সেই সময়ে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা কিংবা থাকার চেষ্টা করা কিছু মানুষের ছবি।

AMARBOI.COM